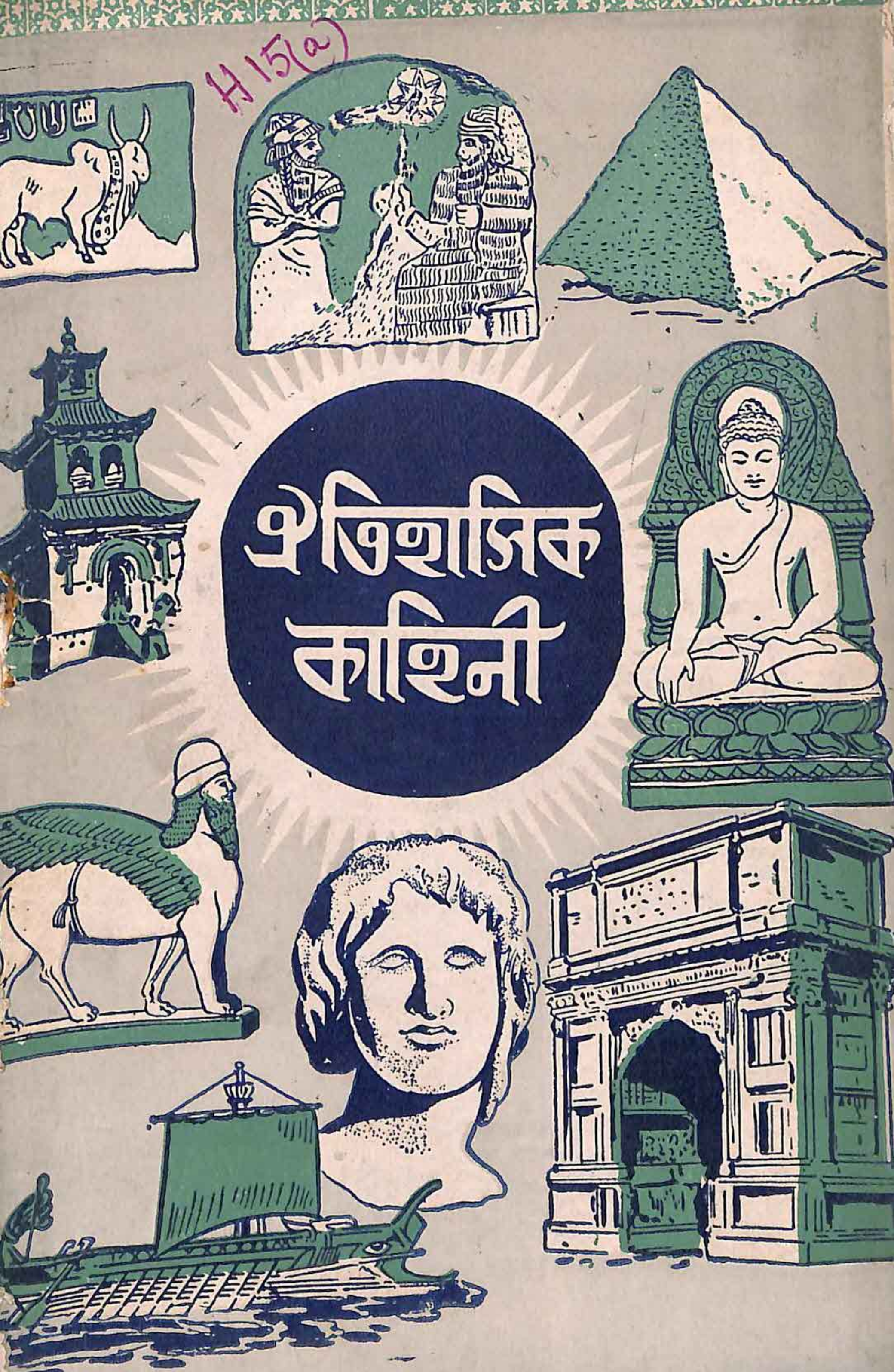


ঐতিহাসিক কাহিনী

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education
as a Text Book on HISTORY for Class VII
Vide Board's T. B. No. TB/VII/H/81/38 dated 8. 1. 81.

ঐতিহাসিক কাহিনী

[মধ্যযুগ]

শ্রীবলরাম ঘোষ ; এম. এ. ; বি. টি.
অভিজ্ঞ শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ,
উদয়রামপুর পল্লীশ্রী শিক্ষায়তন,
২৪-পরগণা।

: পরিবেশক :
টিচার্স বুক স্টল
৬/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বেরা
৬/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : মে, ১৯৮০
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৮২
চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৮৩
পঞ্চম সংস্করণ : ১৯৮৫

দি এলায়েড এণ্টারপ্রাইজার্স
২০৯-সি, বিধান সরণী হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগ

ইউরোপ

রোম হল মানবসভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি। ভূমধ্যসাগরের চারপাশে ইটালীর রাজধানী রোমকে কেন্দ্র করে এক বিশাল সাম্রাজ্য ও সুমহান সভ্যতা পাঁচশো বছর ধরে গড়ে উঠেছিল। এই সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ছিলেন রোমুলাস্ অগাষ্টাস্। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওডোভাকার নামে বর্বর জার্মান জাতির এক দলপতি রোমুলাস অগাষ্টাসকে সিংহাসনচ্যুত করে রোমের সিংহাসন দখল করেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন কাল থেকেই ঐতিহাসিকেরা ইউরোপের মধ্যযুগ গণনা করে থাকেন। আবার ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্ট্যাণ্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে রেনেসাঁস দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলে নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র, নতুন শিক্ষাধারা ও নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের কাল থেকে ইউরোপে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাসে মোটামুটি পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছরকে মধ্যযুগ বলে গণ্য করা হয়।

ভারত

ভারতবর্ষেও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ বলে গণ্য করা হয়। পঞ্চম শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র দেখা দেয় এবং সম্রাটদের অধীনে বহু সামন্ত করদ রাজা সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছোট ছোট রাজ্যগুলো শাসন করতে থাকেন। সুতরাং ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের সময়-সীমা এক হাজার বছরের অধিককাল। এক কথায়, ভারতে মুসলমানদের শাসনকালকেই মধ্যযুগ বলা হয়।

অতএব প্রচলিত মত অনুসারে ইউরোপ এবং ভারত—উভয় ক্ষেত্রেই পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ বলে বর্ণিত হয়। কিন্তু এই সময়সীমা অযৌক্তিক ও তথ্যাভিত্তিক নয় বলে মনে হয়।

নদীর জল যেমন বয়ে যায়, ইতিহাসও তেমনি অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে। নদীর স্রোতকে ভাগ করে পৃথক পৃথক অংশ দেখান যায় না। ইতিহাসের বেলাতেও তাকে একেবারে খণ্ড খণ্ড করে দেখা ঠিক নয়। সারা ইতিহাসের মধ্যে একটা অখণ্ড ঐক্যসূত্র আছে। ঐতিহাসিক পরিবর্তন কখনও হঠাৎ হয় না। ইহার রূপান্তর সর্বদাই দীর্ঘকাল ধরে ঘটতে থাকে। যুগ পরিবর্তন যেহেতু সময়-সাপেক্ষ, সেই হেতু যুগ-বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হয় আগের যুগের মধ্যে। মধ্যযুগকে জানতে হলে প্রাচীন যুগের শেষভাগের বহু ঘটনা

Revised /New Edition Published in 1981.

তথ্য জানতে হয়। মধ্যযুগের মধ্যে প্রাচীনযুগের কিছু কিছু তথ্য ঢুকে আছে। সুতরাং পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী যে মধ্যযুগের সময়-সীমা, ইহা সর্বত্র সমান বা একরূপ নয়। তাছাড়া, মধ্যযুগের কোন নির্দিষ্ট একক ছক নেই যাতে ঐ সময়কালকে সুনির্দিষ্ট বলে সমর্থন করা যায়।

ইউরোপে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন যে অকস্মাৎ মধ্যযুগের সূত্রপাত করলো আর রেনেসাঁস যে হঠাৎ আধুনিক যুগের আবির্ভাব ঘটালো, তা ঠিক নয়। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পরে রোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতা এবং বর্বর উপজাতিদের আক্রমণ শুরু হয়। তারপর থেকে হূণ, গথ, ভ্যান্ডাল প্রভৃতি উপজাতিরাই রোম দখল করে লুটপাট করেছিল। সুতরাং মধ্যযুগের অশান্তি, অরাজকতা, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের আগে থেকেই আরম্ভ হয়। বিপরীত পক্ষে, রেনেসাঁস আন্দোলন হল মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা—এ কথাকেও মেনে নেওয়া যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চারশো বছর ধরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিকযুগের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং কনস্টান্টিনোপলের পতন—এই একটা ঘটনাই যে মধ্যযুগকে পরিবর্তন করে আধুনিকযুগে রূপান্তরিত করেছিল, এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়।

যদি ভারতের ক্ষেত্রে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে ঐতিহাসিকেরা ভারতের মধ্যযুগ বলতে মুসলিম যুগের উল্লেখ করে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে কুতুবউদ্দিন আইবক কর্তৃক ভারতে স্থায়ী বৈদেশিক মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরবী, গজনী, ঘুরী, আফগান, তুর্কী, মোঙ্গল বিভিন্ন সময়ে পাঁচ শো বছর ধরে ভারতের দ্বারে আঘাত হেনেছিল। এই সময়ের মধ্যে মুসলমানরা রাজ্য জয় করেছে, ভারতের ধনসম্পদ, সোনা-দানা লুণ্ঠন করেছে, মসজিদ নির্মাণ করেছে। কিন্তু মুসলিম রাজত্ব আরম্ভের পূর্বেই অর্থাৎ প্রাচীন যুগেই মুসলিম যুগ শুরু হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তদের পতন, হূণ আক্রমণ ও সামন্ত রাজ্যের উদ্ভব থেকেই মধ্যযুগের সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে মুসলিমযুগ শেষ হওয়ার আগেই ব্রিটিশযুগের সূচনা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেছে, কুঠি নির্মাণ করেছে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। সুতরাং কোথায় যে ব্রিটিশ যুগকে কেন্দ্র করে বর্তমানযুগ আরম্ভ, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ভারতে আকবরের রাজত্বকালেই বর্তমানযুগের আরম্ভ। সুতরাং ভারতবর্ষে পঞ্চম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী—এই এগার শো বছর হল মধ্যযুগের সময়-কাল।

সুতরাং মধ্যযুগের সময়-কাল ইউরোপ ও ভারতে সমান নয়। ঘটনার ধারাবাহিকতার এত বৈচিত্র্য ও অসমতা রয়েছে, পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে ঘটেছে যে রোমান সাম্রাজ্যের

মধ্যযুগ ও ভারতের মধ্যযুগ একরূপ নয়। তাছাড়া মধ্যযুগের চেহারা ও যুগবৈশিষ্ট্য রোমান সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষে সমান নয়।

অনুশীলনী

বিষয়-মুখী প্রশ্ন :

১। রোমের শেষ সম্রাট কে ছিলেন?
২। কত সালে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?
৩। রোমের পতন যে দলপতির হাতে ঘটে তার নাম কি?
৪। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কি?
৫। কত সালে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?
৬। রোম সাম্রাজ্য কোথায় গড়ে উঠেছিল?
৭। রোম সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে কত সময় লেগেছিল?
৮। রেনেসাঁস কখন দেখা দেয়?
৯। মধ্যযুগের মোটামুটি কাল কতটুকু?
১০। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী সম্রাট কে ছিলেন?
১১। ভারতবর্ষে কাদের শাসনকালকে মধ্যযুগ বলা হয়?
১২। থিয়োডোসিয়াস কে ছিলেন?
১৩। ভারতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত কখন থেকে শুরু?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ইতিহাসের কালকে নির্দিষ্ট সীমারেখার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার অসুবিধা কি?
২। মধ্যযুগকে জানতে হলে প্রাচীন যুগের বহু ঘটনা জানতে হয় কেন?
৩। রেনেসাঁসকে মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের সীমারেখা বলে মেনে নেওয়া যায় না কেন?
৪। মধ্যযুগ বলতে কি বুঝায়?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্যে মধ্যযুগ

রোমান সাম্রাজ্যে জার্মান উপজাতি ও হূণদের আক্রমণ। রোমান সাম্রাজ্যের পতন

রোম গ্রীক সভ্যতার মত মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন লীলাভূমি। সুদীর্ঘ পাঁচ শো বছর ধরে সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল একথা আগেই তোমরা পড়েছ। কয়েক শতাব্দী ধরে রোমান শাসনের ফলে সাম্রাজ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নত সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করল এবং ভূমধ্যসাগর থেকে বহু দূরে অবস্থিত মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশে প্রসারিত হল। কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে রোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল। রোমান সম্রাটগণ ছিলেন দুর্বল ও অত্যাচারী। বড় বড় জমিদারীর মালিক অভিজাত সম্প্রদায় ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলেন। সৈনিকদের উদ্ধত ব্যবহার জনসাধারণ অসন্তুষ্ট। রোমানদের অধীনে যারা ক্রীতদাস ছিল তারা প্রভুদের অত্যাচারে দুঃখময় জীবন সহ্য করতে না পেরে সাম্রাজ্যের নানা স্থানে প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। বহু অর্থ ও লোকক্ষয়ের বিনিময়ে সম্রাটগণ দাসবিদ্রোহ দমন করেছিলেন। স্বভাবতঃই রোমান সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণ

রোমান সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতার কালেই উত্তর ও মধ্য ইউরোপ হতে আসল বর্বর জার্মান উপজাতিসমূহের প্রচণ্ড আক্রমণ। তাদের প্রতিহত করবার ক্ষমতা সেদিন রোমের ছিল না। আক্রমণের চাপে সাম্রাজ্যের সীমান্ত-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। জার্মান উপজাতি-সমূহ দলে দলে রোমান সাম্রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও সম্পত্তি দখল করে নিল। ফলে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল (৪৭৬ খৃঃ)।

জার্মান জাতির পরিচয়

মধ্য ও উত্তর ইউরোপ থেকে যেসব জার্মান উপজাতিসমূহ রোমে এসেছিল তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ফ্রাঙ্ক, ভ্যান্ডাল, গথ ইত্যাদি। গথেরা আবার ভিসিগথ (পশ্চিম গথ) এবং অস্ট্রোগথ (পূর্ব গথ) নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তবে এদের ইতিহাসে একটা সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে জার্মান।

রোমান জাতির বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস সীজার এবং রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস জার্মান উপজাতিদের সম্পর্কে এক বিবরণ লিখে গেছেন। এদের আকৃতি দীর্ঘ, দেহ বলিষ্ঠ এবং বর্ণ গৌর ছিল। মাথার চুল ছিল লাল এবং চক্ষু নীল। এরা আর্য ভাষায় কথা বলত।

এরা গ্রামে খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে বাস করত। গ্রামগুলো ছিল ছাড়া ছাড়া। তাই সারি সারি দীর্ঘ এবং মোটা কাষ্ঠদণ্ড মাটিতে পুঁতে গ্রামগুলোর চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখত। এদের পেশা ছিল শিকার, মাছ ধরা ও পশুপালন। এরা কৃষিকার্যও করত। জমিতে গম, বার্লি, শাকসব্জি ও আপেল উৎপাদন করত। ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া,

হাঁস পুষত। ষাঁড়ে লাঙ্গল এবং ঘোড়া রথ টানত। এরা নিজেদের মধ্যে রথের প্রতিযোগিতা করত এবং জুয়া খেলত। এরা যুদ্ধবিগ্রহ ভালবাসত। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এরা যুদ্ধ করত। এদের মধ্যে পদাতিক সেনাও ছিল। এদের অস্ত্র ছিল বর্শা, তরবারি ও কুঠার। আত্মরক্ষার জন্যে চামড়ার তৈরী ঢাল ও টুপি ব্যবহার করত। দলপতিরা বর্ম পরত। এদের নারীরাও ছিল সাহসী ও নির্ভীক। এরা যুদ্ধের সময়ে স্বামীদের সঙ্গে থাকত। যুদ্ধক্ষেত্রে এরা খাদ্য জোগাত এবং আহতদের সেবা করত। এরা সততা ও মর্যাদাবোধের জন্যে বিখ্যাত ছিল।

প্রত্যেক উপজাতির গ্রামীণ সংগঠন খুব দৃঢ় ছিল। প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসিদলকে নিয়ে এক একটি সঙ্ঘ বা সমিতি গঠিত হত। এদের ক্ষমতা ছিল সর্বোচ্চ। এই সভাই একজন রাজা নির্বাচন করত। দলপতিরা এই সভার নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত মেনে চলত। অনেকগুলি সঙ্ঘবদ্ধ উপজাতির নেতাকে রাজা বলা হত। উপজাতিগুলো কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে বড় গোষ্ঠীগুলো এক হাজার সৈন্য সরবরাহ করতে পারত, আর ছোট গোষ্ঠীগুলোর অধীনে একশত সৈন্য থাকত। তাই এদের হানড্রেডস্ (Hundreds) বলা হত। জনসাধারণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা—অভিজাত সম্প্রদায়, সাধারণ লোক ও ভূমিদাস। রাজপরিবারের লোকজন এবং দলপতিগণ অভিজাত সম্প্রদায় বলে গণ্য হত। এদের নীচে ছিল সাধারণ লোক বা ফ্রিমেন এবং ভূমিদাস বা সার্ফ।

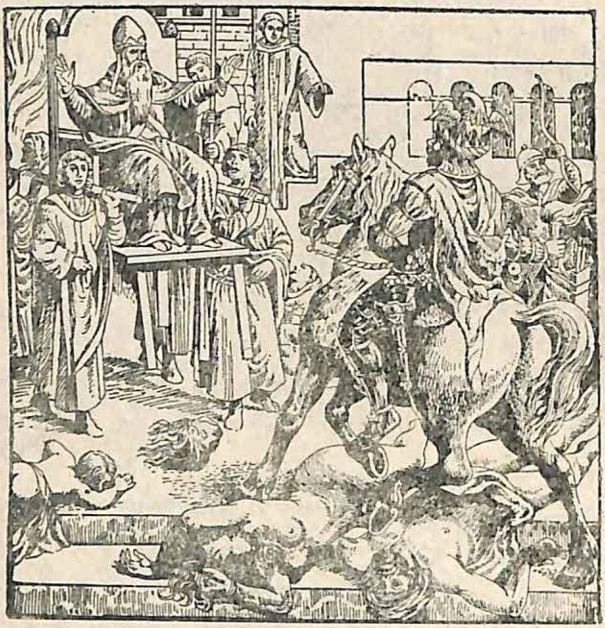
মধ্য ও উত্তর ইউরোপের এইসব জার্মান উপজাতিদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভাব ঘটলে তাদের দৃষ্টি রোমান সাম্রাজ্যের দিকে পড়ে। তাছাড়া ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ রোমের প্রতি তাদের লোভের অন্ত ছিল না। ফলে পুরুষেরা ঘোড়ার পিঠে এবং মেয়ে ও শিশুরা গরুর গাড়ীতে করে নতুন বাসস্থানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ইতিমধ্যে এশিয়ার বর্বর হূণ-জাতি তাদের আক্রমণ করে। একদিকে হূণ আক্রমণে পরাজয় ও ভয় এবং অন্যদিকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ রোমে লুণ্ঠনের লোভ এই দুই কারণে জার্মান উপজাতিগুলো রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

এইভাবে ফ্রাঙ্ক, গথ, ভ্যান্ডাল প্রভৃতি জার্মান উপজাতিগুলো রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে এসে বসতি স্থাপন করলো। এরা রোমের শাসন মেনে নিল, বহুলোক রোমান সম্রাটদের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হল। ধীরে ধীরে এরা রোমান জনগণের সঙ্গে মিশে গেল। রোমে প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম এই সব উদ্বাস্তু উপজাতিদের উপর প্রভাব বিস্তার করল। এরাও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করল এবং শান্তিপূর্ণভাবেই বাস করতে লাগল।

হূণ আক্রমণ

চতুর্থ শতাব্দীতে হূণজাতি খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এরা মধ্য এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ বর্বর জাতি। এরা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত, এই যাযাবর জাতি কোথাও স্থিরভাবে ঘরে বা তাঁবুতে বাস করত না। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াত। এরা

দেখতে বেঁটে এবং কালো ; ছোট ছোট চোখ, বোঁচা নাক, খাড়া খাড়া চুল ছিল বলে এরা অত্যন্ত কদাকার। তবে এরা নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির লোক ছিল। গল্প আছে, এরা মেয়েদের, এমনকি শিশুদের পর্যন্ত পায়ের তলায় দলে পিষে মারত। জীবন্ত মানুষকে বা হাতীকে পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে দিয়ে আনন্দ পেত।



বর্বর জাতির আক্রমণ ও অত্যাচার

এই হূণজাতি ঝড়ের বেগে ইউরোপে হাজির হয়ে ভিসিগথদের আক্রমণ করল। নিরুপায় ভিসিগথেরা তখন রোমের পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেল এবং রোমান সাম্রাজ্যের উপর হানা দিতে লাগল। এদের এক রাজার নাম এ্যালারিক। ইনি ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোম অধিকার করে উহা লুণ্ঠন করলেন। রোমান সম্রাট এ্যালারিকের কাছে হেরে গেলেন। যে রোমের ভয়ে একদিন সমস্ত জগৎ কাঁপত, সেই রোম দখল করল বর্বর ভিসিগথেরা। এ্যালারিক গোটা রোমনগরী অবরোধ করে এমনভাবে শোষণকার্য চালালেন যে শেষ পর্যন্ত নগরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রোমের নাগরিকেরা অবশেষে ৫০০০ পাউণ্ড ওজনের সোনা, ৩০,০০০ পাউন্ড ওজনের রুপো, ৪০০০ ভালো রেশমের পোষাক, ৩০০০ খণ্ড সূক্ষ্ম লাল বস্ত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের বিনিময়ে রোমের মুক্তি ভিক্ষা করল। সে যাত্রা রোম রক্ষা পেল বটে, ৪১০ খৃষ্টাব্দে আবার এ্যালারিক রোম আক্রমণ করলেন। বাধা দেবার মত শক্তি রোমের ছিল না। এ্যালারিকের বর্বর সৈন্যবাহিনী মহানগরীর সর্বত্র লুণ্ঠন ও হত্যা চালাল।

কিন্তু রোম নগরীর দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা এখানেই শেষ হয়নি। এ্যালারিকের লুণ্ঠনের ৪০ বৎসর পরে বর্বর ভ্যান্ডাল জাতির জেইসেরিক আফ্রিকায় কার্থেজে রাজ্য-স্থাপন করলেন এবং সেখান থেকে ৫৪৫ খৃষ্টাব্দে আবার রোমনগরী লুণ্ঠন করেন। তারপর থেকেই রোমনগরী যেন শ্মশানে পরিণত হল।

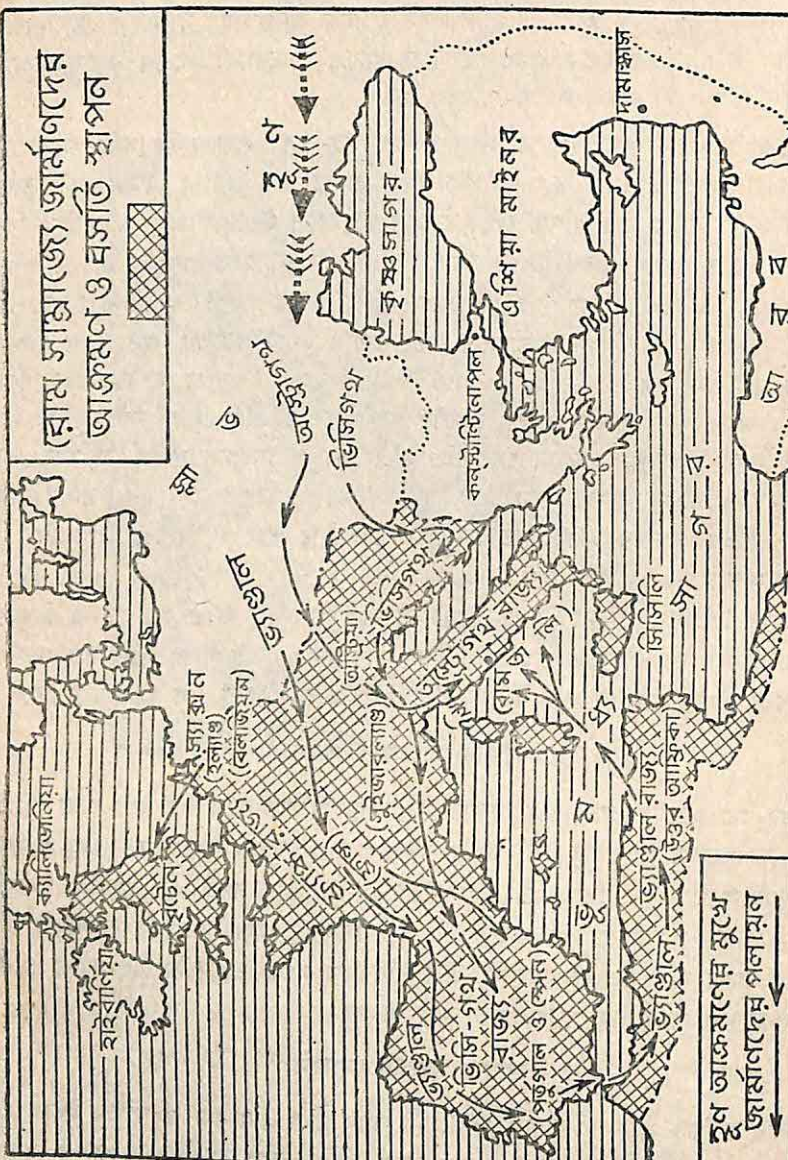
চতুর্থ শতাব্দী থেকেই হূণ আক্রমণ শুরু হয়েছিল। হূণেরা যে সময় পরাক্রমে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে উন্নতির চরমে উঠেছিল, তখন তাদের রাজা ছিলেন এটিলা। তাঁর রাজত্ব-কালে হূণ সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া থেকে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর সীমার কাছাকাছি বিস্তৃত ছিল। তাঁর প্রধান শিবির ছিল হাঙ্গেরীতে। দুর্ধর্ষ ও হিংস্র প্রকৃতির এই হূণ বীর প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ৪৫০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম ইউরোপের দিকে রওনা হলেন এবং ৪৫১ খৃষ্টাব্দে গল বিধ্বস্ত করলেন, কত শহর লুটপাট করলেন, কত শহর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নররক্তে পথঘাট প্লাবিত হল। অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কাতর ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভরে গেল। নগরীর প্রাচীর ভেঙে এটিলার বাহিনী নগরীর মধ্যে প্রবেশ করল। অবশেষে রোমান সেনাপতি ইটিয়াসের পতাকাতলে ফ্রাঙ্ক, ভিসিগথ এবং অন্যান্য উপজাতিরা মিলিত হয়ে এটিলার আক্রমণ প্রতিহত করল। ফ্রান্সের ট্রয়েস নামক শহরের এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মঙ্গোলীয় হূণ এবং ইউরোপীয় উপজাতি ও রোমান সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ হল। এটিলা এই যুদ্ধে পরাজিত হলেন (৪৫১ খ্রীঃ)। পর বৎসর এটিলার বাহিনী উত্তর ইটালী আক্রমণ করে বহু নগর লুটপাট ও বিধ্বস্ত করল। অবশ্য ৪৩৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ এটিলা মারা যান। এই দানব প্রকৃতির লোকটি নিষ্ঠুরতা এবং নৃশংসতার জন্যে ইতিহাসে "ভগবানের অভিশাপ" বলে খ্যাত হয়ে আছেন।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন

এর পর জার্মান উপজাতিরা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জয় করে রাজ্য স্থাপন করল। ভ্যান্ডালরা আফ্রিকায়, ভিসিগথরা দক্ষিণ গল ও স্পেনে এবং ফ্রাঙ্করা মধ্য ও উত্তর গথে রাজ্যস্থাপনে মন দিল। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ওডোভাকার নামে এক জার্মান দলপতি পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ নাবালক রাজা রোমুলাস্ অগাষ্টাসকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন। ঐতিহাসিকগণ পঞ্চম শতাব্দীর এই ঘটনা থেকেই পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন গণনা করে থাকেন।

রোমের পতনের ফলাফল

বর্বর জাতির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটল এবং মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের বহুস্থানে বর্বর দলপতিরা ছোট ও বড় রাজ্য স্থাপন করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে লাগল। ভিসিগথদের স্পেন রাজ্য, অষ্ট্রোগথদের ইটালী রাজ্য, ফ্রাঙ্কদের ফরাসী, ভান্ডালদের আফ্রিকা রাজ্য এবং জার্মান রাজ্য স্থাপিত হল। কিন্তু তারা পরস্পরের সঙ্গে ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ফলে রোমান সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা একেবারে লোপ পেল। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বাধাপ্রাপ্ত হল।


রোম সাম্রাজ্যে জার্মানদের আক্রমণ ও বসতি স্থাপন
হূণ আক্রমণের মুখে জার্মানদের পলায়ন
কৃষ্ণসাগর
এশিয়া মাইনর
কনস্টান্টিনোপল
দামাস্কাস
ভিসিগথ
অস্ট্রোগথ
ক্যালিডোনিয়া
হাইবার্নিয়া
ব্রিটেন
রোম
সিসিলি
ভ্যাণ্ডাল রাজ্য
(উত্তর আফ্রিকা)
(পর্তুগাল ও স্পেন)
হূণ

তৃতীয়তঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্ধকার নেমে এল। চতুর্থতঃ রোমান সভ্যতা প্রায় লোপ পেল এবং ইউরোপে নিকৃষ্ট সভ্যতাই চালু হল। সবশেষে দস্যুদলপতিদের নিজ নিজ রাজ্যে যথেচ্ছাচার শাসনে এবং পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটিতে প্রবৃত্ত থাকার ফলে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হল। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম হল রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তূপের উপর কতকগুলো নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং রোমানদের প্রাচীন আইনবিধি এবং রাজনৈতিক ঐক্য বিষয়ে রোমান চেতনা বেঁচে রইল।

ঘটনাপঞ্জী

৪১০ খৃঃ অঃ—ভিসিগথ রাজ এ্যালারিকের রোম দখল।

৪৫১ খৃঃ অঃ—এটিলার গল আক্রমণ ও রোমান সেনাপতির হাতে পরাজয়।

৪৭৬ খৃঃ অঃ—পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কত সালে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটল?

২। এটিলা কত সালে গল আক্রমণ করেন?

৩। এটিলা কে ছিলেন?

৪। এটিলাকে কোন্ রোমান সেনাপতি পরাজিত করেন?

৫। কাকে "ভগবানের অভিশাপ" বলা হয়?

৬। বর্বর উপজাতিগুলোর সাধারণ নাম কি ছিল?

৭। এ্যালারিক কত সালে রোম অধিকার করে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কারা জার্মান উপজাতি নামে পরিচিত?

২। কি কি শর্তে রোমানরা এ্যালারিকের নিকট রোমের মুক্তি ভিক্ষা করল?

৩। কি কি কারণে জার্মান উপজাতিরা রোমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল?

৪। হূণ কাদের বলা হয়?

৫। জার্মান উপজাতিরা কিভাবে কাকে রাজা নির্বাচিত করত?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

২। জার্মান উপজাতিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় দাও।

৩। হূণ জাতি ও তাদের রাজা এটিলার পরিচয় দাও।

৪। এ্যালারিকের রোম লুণ্ঠনের বিবরণ দাও।

৫। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলাফল বর্ণনা কর।

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। রোমান জাতি বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর——।

২। ৪১০ খ্রীঃ অঃ রোমান সম্রাট——কাছে হেরে গেলেন।

৩। গথেরা——ও——নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

৪। ৪৭৬ খ্রীঃ অঃ——নামে এক জার্মান দলপতি রোমের রাজা হন।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপে অন্ধকার যুগের ইতিবৃত্ত

চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর ইউরোপের চেহারা

চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত চারশ' বছর মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করলে একথা অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েক শ' বছর ধরে ইউরোপে চলছিল এক অন্ধকারের যুগ। তখন না ছিল শিক্ষা, না ছিল সভ্যতা। লোকের একমাত্র কাজ ছিল লড়াই করা। "জোর যার মুল্লুক তার"—এই ছিল তখনকার প্রচলিত নীতি। গথ, ভ্যান্ডাল, হূণ প্রভৃতি বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের বহুস্থানে বর্বর দলপতিরা ছোট-বড় রাজ্য স্থাপন করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে লাগল। তারা পরস্পরের সংগে ঘন ঘন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত। ফলে রোমান সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা একেবারে লোপ পেল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বাধাপ্রাপ্ত হল। দস্যু দলপতিরা নিজ নিজ রাজ্যে যথেচ্ছাচার শাসনে এবং পরস্পরের সংগে মারামারি, কাটা-কাটিতে প্রবৃত্ত থাকার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা হল দুর্বিষহ। দুর্বলের উপর চলল সবলের অত্যাচার ; দেশময় অরাজকতা। এই অবস্থা দেখেই ঐতিহাসিকেরা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের চার শ' বছরকে অন্ধকারের যুগ বলেই অভিহিত করেন।

অন্ধকার নয়

কিন্তু চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টান মঠগুলো যে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দীপশিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছিল তা পরবর্তীকালের ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আলোকপাত করেছিল—এ কথা বিচার করলে চার শ' বছরকে ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের খাঁটি ইতিহাস পাওয়া যায় না। কেননা, ইউরোপের খুব কম স্থানেই মানুষ লিখতে পারত, লেখার উৎসাহও ছিল অল্প। কেউ তার লেখা পান্ডুলিপির নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল না অথবা সে লেখা যে আবার কেউ পড়বে তেমন সম্ভাবনাও ছিল না। কাজেই সে সময়ের সঠিক ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর।

খ্রীষ্টান মঠে শিক্ষার অনুশীলন

খ্রীষ্টান ধর্মের উৎপত্তির বহু পূর্ব থেকে ইউরোপে মঠের অস্তিত্ব ছিল। এই মঠগুলোতে পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও নানেরা ধর্ম ও শাস্ত্র চর্চা করতেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিলে বহু রোমান ও গ্রীক পণ্ডিতগণ অন্যান্য নগরবাসীদের মত মঠেই আশ্রয় নিতেন এবং সেখানেই তাঁদের সংগে নীত পুঁথিগুলো নিয়েই তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। বিদেশী বর্বরদের আক্রমণকালে খ্রীষ্টান মঠগুলোই ছিল ইউরোপের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। সুতরাং পণ্ডিতগণ তাদের লিখিত পান্ডুলিপি সহ

মঠগুলোতে নিরাপত্তার জন্যে আশ্রয় নিতেন। ফলে বাহ্যিক বিপর্যয়ের সংগে সংগে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পুঁথিগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় নি। এতএব, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে গ্রাম, শহর ও নগরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হলেও খ্রীষ্টান মঠগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা জাগরূক ছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে যে নতুন সমাজ-গঠন চলছিল তার সূত্রপাত ঘটেছিল কিন্তু খ্রীষ্টান মঠের বিধানাবলী ও আদর্শ থেকে।

সন্ন্যাসী বেনেডিকটের ও ক্যাসিডোরাসের অবদান

ইটালীর বিখ্যাত সন্ন্যাসী বেনেডিক্‌ট পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপের মঠগুলোতে শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। বেনেডিক্‌ট তাঁর সাধনালব্ধ আদর্শ দ্বারা খ্রীষ্টান মঠগুলোতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তার উত্তরসাধক ছিলেন পোপ গ্রেগরী ও সন্ন্যাসী ক্যাসিডোরাস্‌। তাঁরা বেনেডিকটের পদ্ধতি অনুসরণ করে পশ্চিম ইউরোপের মঠগুলোতে শিক্ষা ও পঠন-পাঠন প্রচলন করেন। বিশেষতঃ ক্যাসিডোরাস্‌ সামগ্রিকভাবে সমাজে শিক্ষার অবক্ষয়ে, পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্য ও সকল প্রকার শিক্ষার ধ্বংসের সম্ভাবনায় গভীরভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং বেনেডিক্টের পদ্ধতি নিষ্ঠার সংগে অনুসরণ করে মঠের সন্ন্যাসী ভ্রাতাগণকে প্রথম শিক্ষার সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের কাজে নিয়োগ করেন। তিনি নিজেই প্রাচীন পুঁথিগুলোর নকল করান, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের পুঁথিগুলোকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করান। তিনি জলঘড়ি, সূর্য-ডায়াল এবং অনুরূপ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে বিজ্ঞানের গবেষণায় শেষ আলোক-রশ্মি জ্বালিয়ে রাখেন। তিনি গথিক রাজাদের ইতিহাস এবং বিদ্যালয়ের জন্যে ব্যাকরণ ও শিল্পের উপর গ্রন্থমালা রচনা করেন। ধীরে ধীরে দেশে শিক্ষাদানের আবহাওয়া ফিরে আসতে থাকে। এই ভাবে পাশ্চাত্যজগতে শিক্ষা ও সমাজের পুনর্গঠনে বেনেডিক্ট অপেক্ষা ক্যাসিডোরাসের অবদান বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মঠের ভূমিকা

সপ্তম শতাব্দীতে মঠগুলোই ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। সর্বত্র বেনেডিক্টের শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষার সংরক্ষণ, আবশ্যকীয় শিল্পকলার প্রসার, কৃষির পুনরুজ্জীবন ও মান উন্নয়ন, পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও গুদামজাত করার কেন্দ্রস্থল ছিল সপ্তম শতাব্দীর অসংখ্য মঠ। এমন কি বেনেডিক্ট পদ্ধতি অনুসৃত মঠসংলগ্ন বিদ্যালয়েই মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এমন এক সময় ছিল যখন গল দেশের পুরোহিতগণ ধর্মপুস্তক পড়তে পারতেন না, কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে বেনেডিকটীয় মঠগুলোর পুরোহিতগণের শিক্ষাদান করা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য ছিল। মঠগুলোতে শিক্ষা ও সাহিত্যের অনুশীলন যদি না হত, তাহলে পরবর্তী আট শতাব্দী কালের পৃথিবী সম্পূর্ণ আদিম ও অন্ধকার হয়ে পড়ত।

অবশ্য প্রাচ্যে শিক্ষার ধারাবাহিকতা কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল, কিন্তু সেখানে সামাজিক বিশৃঙ্খলার কোন কারণ ছিল না। জ্যাষ্টিনিয়ান ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে এথেন্সের বিদ্যালয়গুলো

বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা শুধুমাত্র কনষ্ট্যান্টিনোপলে সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তিনি নির্মাণ করেছিলেন তার প্রতিদ্বন্দী বিদ্যালয়গুলোকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যেই করেছিলেন।

পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নতুন ল্যাটিন শিক্ষার কোন পাঠ্যপুস্তক এবং নিজস্ব সাহিত্য ছিল না। তাই গ্রীক সাহিত্যের ল্যাটিন গ্রন্থগুলো এবং ল্যাটিন অনুবাদগুলোর উপরেই তাদের নির্ভর করতে হত। সেকারণে ঐ গ্রন্থ ও অনুবাদগুলোকে সযত্নে রক্ষা করতে হত।

ধর্মসংক্রান্ত ন্যায়-অন্যায় বোধ

বর্বরদের আক্রমণে সমাজ-জীবনে ন্যায়-নীতি বোধ যখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত নর-নারী আত্মআসক্তির দাস হয়ে পড়েছিল, তখন মঠ ও গির্জায় আশ্রিত ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বোধ মরে যায় নি। সপ্তম শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে এগুলো প্রভাবিত করেছিল। খ্রীষ্টান গির্জার সৎ জীবন যাপনকারী অসংখ্য পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও নানেরা পরবর্তী শতাব্দীর পশ্চিম ইউরোপে শিক্ষা ও সংহতি স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ভবিষ্যতে যে নতুন এবং মহত্তর এক সংহত খ্রীষ্টীয় রাজ্যসংঘ গড়ে উঠেছিল, তা হাজার হাজার পরিচয়বিহীন, বিশ্বাসী ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিরলস চেষ্টার ফল। তাদেরই ধর্মসংক্রান্ত ন্যায়-অন্যায় বোধ ভাবীকালের ইউরোপীয় সভ্যতায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর পতন ও বিশৃঙ্খলার পর ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে খ্রীষ্টান মঠ-সংগঠনের প্রভাবে পাশ্চাত্য জগতে সমাজব্যবস্থা নতুন করে দানা বেঁধে উঠেছিল, পরবর্তীকালে সম্রাটগণ ধর্ম ও রাজ্যশাসন ব্যাপারে পুরোহিত শ্রেণীর পরামর্শ নিতেন। রাজসভায় পুরোহিতগণের ডান পাশে অবস্থান করে সম্রাট রাজকার্য পরিচালনা করতেন। সমাজে পুরোহিতগণের ন্যায়-অন্যায় বোধের প্রভাব এইভাবে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীকেই ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ বলা সংগত হবে না।

অনুশীলনী

১। চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

২। চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর খাঁটি ইতিহাস পাওয়া যায় না কেন?

৩। বেনেডিক্ট কে ছিলেন? তিনি কিভাবে মঠগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করেন?

৪। অন্ধকার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্যাসিডোরাসের অবদান নির্ণয় কর।

৫। শিক্ষার অনুশীলনে খ্রীষ্টান মঠগুলোর ভূমিকা নির্ধারণ কর।

৬। যাজক সম্প্রদায়ের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা কিভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল?

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য ও উহার সভ্যতা

বাইজাণ্টিয়াম্ (কন্স্টাণ্টিনোপল্)

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ বর্বর জাতিদের দ্বারা বিজিত হবার পর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায়। কিন্তু বলকান উপদ্বীপ; এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশগুলো পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য নামে আর এক শ্রেণীর রোমান সম্রাট দ্বারা শাসিত হত। রোমান সম্রাট কন্স্টাণ্টাইন আধুনিক তুরস্কের বাইজাণ্টিয়াম্ নগরীতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাট কন্স্টাণ্টাইনের নাম অনুসারে ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ হতে এর নতুন নাম হল কন্স্টাণ্টিনোপল্। এর বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল, বর্তমান তুরস্ক রাজ্যের রাজধানী।



পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত রোম সাম্রাজ্য

এক সময়ে কন্স্টাণ্টিনোপল গ্রীকদের একটি উপনিবেশ ছিল। তখন একে বলা হত বাইজাণ্টিয়াম। এজন্য পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের আর এক নাম বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য। সম্রাট কন্স্টাণ্টাইনের আমলে বাইজাণ্টিয়াম্ নগরীর গৌরব বাড়তে থাকে। সে সময়ে বাইজাণ্টিয়ামে গ্রীক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচলিত ছিল। সম্রাট কন্স্টাণ্টাইন্ এই ধর্মমতকে বাইজাণ্টিয়ামের সরকারী ধর্মে পরিণত করেন। জনসাধারণ রোমান চার্চের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন এই ধর্মমত গ্রহণ করেছিল।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের খ্যাতিমান সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ান। তাঁর রাজত্বকাল শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন-প্রণয়ন ও পূর্বতন রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে স্মরণীয়। জাস্টিনিয়ান ছিলেন বল্কান অঞ্চলের সামান্য এক কৃষক পরিবারের সন্তান। তাঁর কাকা ছিলেন সম্রাটের দেহরক্ষী সৈন্যদের সেনাপতি। জাস্টিনিয়ান কাকার কাছে থেকে লেখাপড়া শেখেন। নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতাবলে তিনি পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন ৫২৭ খ্রীঃ অঃ। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব উদ্ধার করা। এ কাজে তাঁর ডান-হাত ছিলেন তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি বেলিসেরিয়াস। প্রথম জীবনে বেলিসেরিয়াস ছিলেন জাস্টিনিয়ানের একজন দেহরক্ষী। পরে তিনি সম্রাটের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন। সম্রাট বেলিসেরিয়াসের সাহায্যে ভ্যান্ডাল জাতিদের কাছ থেকে আফ্রিকা উদ্ধার করেন। পূর্বে পারস্য সম্রাটের সঙ্গে বেলিসেরিয়াসের যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধে তিনি সুবিধা করতে না পারায় জাস্টিনিয়ান পারস্য সম্রাটের সঙ্গে



সম্রাট জাস্টিনিয়ান

শান্তি স্থাপন করেন। পশ্চিমে বেলিসেরিয়াস তাঁর বিজয় অভিযান চালিয়ে গেলেন। তিনি সিসিলি দখল করলেন। তারপর তিনি ইটালীতে অভিযান চালিয়ে গথদের হারিয়ে দিলেন। গথেরা অবশ্য পরে বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু বেলিসেরিয়াস এ বিদ্রোহ দমন করলেন। তাঁর সাফল্য দেখে জাস্টিনিয়ানের বোধ হয় ঈর্ষা হল। তিনি বেলিসেরিয়াসকে দেশে ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনে তিনি সম্রাটের ক্রোধ ও সন্দেহের পাত্র হন। সম্রাট তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করলেন এবং তাকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। তারপর জাস্টিনিয়ান আর একজন সেনাপতি পাঠিয়ে অস্ট্রোগথদের কাছ থেকে ইটালী এবং ভিসিগথদের কাছ থেকে দক্ষিণ স্পেন উদ্ধার করেন।

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের লক্ষ্য পূর্ণ হল। তিনি পশ্চিম ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে একত্র

করে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর এ গৌরবময় কাজের জন্যে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ৫৬৫ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

অবশ্য জাস্টিনিয়ানের রাজত্বের শেষভাগে বর্বর হূণরা আবার রাজধানীর দিকে হানা দিল। তখন আবার বৃদ্ধ বেলিসেরিয়াসের ডাক পড়ল। তাঁর যুদ্ধ-কৌশলে হূণরা হেরে গিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু এমন সুদক্ষ সেনাপতির শেষ জীবন বড় করুণ। গল্প আছে যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে রাজধানীর পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতেন। সঙ্গে ছিল এক তরুণ পথ-প্রদর্শক। দৈবক্রমে ঐ তরুণ সর্পাঘাতে মারা গেলে বেলিসেরিয়াস তার মৃতদেহ কাঁধে করে লাঠিতে ভর দিয়ে রাজপথে ঘুরেছিলেন।

জাস্টিনিয়ান কোড ও এর গুরুত্ব—কিন্তু জাস্টিনিয়ানের প্রধান খ্যাতি সমর-বিজেতা হিসেবে নয়, ইতিহাসে তিনি আইনগ্রন্থ-প্রণেতা হিসেবেও বিখ্যাত। তাঁর আইন-সংক্রান্ত কাজ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ তিনি সে সময়ের আইনবিষয়ক পণ্ডিতদের সাহায্যে



সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা (তুর্কিগণ কর্তৃক পরে মসজিদে পরিণত হয়)

রোমানদের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত আইন সংগ্রহ করে "জাস্টিনিয়ানের কোড" নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। দ্বিতীয়তঃ ষোল জন আইন বিশেষজ্ঞের একটি কমিটি গঠন করে তিন বছর ধরে রোমের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করান এবং জনগণের ব্যবহারযোগ্য করে সাজিয়ে পৃথক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তার নাম দেওয়া হয় "আইনের সংক্ষিপ্তসার"। তৃতীয়তঃ "ইন্‌ষ্টিটিউটস্‌" নামক গ্রন্থে আইন

অধ্যয়নরত ছাত্রগণের সুবিধার জন্যে রোমান আইনের মূল তত্ত্বগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। সবগুলো একত্রে "জাস্টিনিয়ানের আইন" নামে পরিচিত। তিনি সুসংগঠিত আইন প্রণয়ন ও পুরানো রোমান বিধানাবলী সংগ্রহের জন্যে পৃথিবীর ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। জাস্টিনিয়ানের আইন সভ্য দেশের আইন প্রণেতাদের কাছে আদর্শ হয়ে আছে। আজও পৃথিবীর বহু দেশে তাঁর আইনের মূল নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। আধুনিক ইউরোপের সকল সুশৃঙ্খল আইন প্রণয়নের ভিত্তিভূমি হল জাস্টিনিয়ানের আইনবিষয়ক গ্রন্থগুলো।

খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ—খ্রীষ্টধর্মের প্রতি জাস্টিনিয়ান একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই ধর্ম বিস্তারের জন্যে তিনি আরব, সুদান এমন কি সাহারা প্রদেশেও প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সময়েই রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

স্থাপত্য-শিল্প ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক—স্থাপত্য-শিল্প ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জাস্টিনিয়ানের খ্যাতি ছিল। তিনি সেণ্ট সোফিয়ার জগদ্‌বিখ্যাত গির্জা স্থাপন করেন। এই সুন্দর গর্জা আজও বিদ্যমান। সে যুগের স্থপতিবিদ্যার বিস্ময়কর নিদর্শন। গির্জার হলঘরটি ছিল প্রকাণ্ড, এর উচ্চতা ছিল ২৭০ ফুট। ভিতরের ছাদ ও বেদী সোনার তৈরী ছিল। সোনা, রুপো, নানা রঙের পাথরের উপর কারুকার্য করে গির্জাটিকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। ভিতরে আলোর ব্যবস্থা ছিল—সেই আলোকে হলঘরের ছাদে আঁকা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মূর্তি দেখে উপাসকেরা মোহিত হয়েছিল। মুসলমান আমলে অবশ্য কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর আমলে প্রাসাদ, দুর্গ, সেতু নির্মিত হয়েছিল। শিল্পীগণ গির্জা ও প্রাসাদের নানারূপ কারুকার্য করতেন। চিত্রগুলোর সাহায্যে যীশু খ্রীষ্টের জীবনকথা, বাইবেলের অনেক কাহিনীর বর্ণনা করা হত। গির্জার অভ্যন্তরে ইটালীর অনুকরণে নানা রঙের মোজেইক চিত্র দিয়ে সজ্জিত করা হত। শিল্পীদের সৌন্দর্য অপেক্ষা জাঁকজমকের দিকে নজর ছিল বেশী।

বাইজাণ্টিয়ামের ঐশ্বর্য ও গৌরব

বাইজাণ্টিয়াম্ সে যুগে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। পৃথিবীর বহু দেশের সঙ্গে বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের ব্যবসা চলত। বড় বড় জাহাজ থাকায় জলপথে বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বণিকেরা মিশর ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে সিংহল, ভারত, এমন কি সুদূর রাশিয়াতেও বাণিজ্য করতে যেত আর স্থল-পথে চীন ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলত। সেখান থেকে বণিকেরা উটের পিঠে পণ্য বোঝাই করে ভূমধ্যসাগরের বন্দরে এনে কনস্টাণ্টিনোপলে চালান দিত। এ সময়ে রোমানরা রেশমের চাষ করত। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে একদল খ্রীষ্টান সাধু চীনদেশ থেকে বেতের ঝুড়িতে করে গুটি পোকার ডিম চুরি করে আনেন। তারপর থেকেই দেশে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতায় রেশম চাষ ও শিল্প গড়ে ওঠে। বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য ছিল রেশম, মধু ও মদ। তবে রেশম শিল্পের ব্যবসা একচেটে ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের দৌলতে বাইজাণ্টিয়াম্ সে যুগে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল এবং এখানেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বণিকেরা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে সমবেত হতেন।

বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বাইজাণ্টিয়াম্ নগরী আয়তনে, সৌন্দর্যে এবং সামরিক দুর্ভেদ্যতায় সমগ্র জগতে বিখ্যাত ছিল। দুর্গ প্রাকারে সুরক্ষিত বাইজাণ্টিয়াম্ নগরী দুর্ভেদ্য ছিল। বাইজাণ্টিয়ামকে সম্রাট কন্স্টানটাইন্ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী করে এর স্থাপত্য শোভা বৃদ্ধির জন্যে সব রকমের চেষ্টা করেছিলেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ স্থপতি ও ভাস্করদিগকে নগর, মূর্তি, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করা হয়। নগরের মাঝখানে একটা বিরাট সভামন্ডপ নির্মিত হয়েছিল। এর কেন্দ্রস্থলে ১২০ ফুট উঁচু একটা স্তম্ভ তৈরী হয়েছিল। এই স্তম্ভের চূড়ায় অ্যাপোলো (সূর্য) দেবের একটা বিরাট ব্রোঞ্জের নির্মিত মূর্তি দন্ডায়মান ছিল। গির্জা, স্নানাগার, বিরাট হল, পাথরের তৈরী প্রকান্ড জলাশয়, বৃহৎ প্রাসাদ, সম্ভ্রান্ত লোকের বসবাস করবার জন্যে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাসমূহ নতুন রাজধানী বাইজাণ্টিয়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। এখানকার রাজদরবার জাঁকজমকের জন্যে পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। সারা বছর ধরে নানা রকম উৎসব চলত। এ সময় মূল্যবান পোশাকে সম্রাট সজ্জিত থাকতেন। পোশাকের উপর নানারকম নকশা থাকত। সোনার গাছপালা, সোনার পশুপাখী ও মণিমুক্তোর ফল-ফুল



বাইজান্টাইন কারুকার্য

তৈরী করে উৎসব মণ্ডপ সাজান হত। শিল্পীরা সব এমন কৌশল অবলম্বন করতে পারত যাতে পশুগুলোর মুখ থেকে ভীষণ গর্জন এবং পাখীগুলোর কণ্ঠ থেকে সুমিষ্ট স্বর বার হত। দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শক আসতেন এবং বাইজাণ্টিয়ামের জাঁকজমক দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন।

বাইজাণ্টিয়ামে রাজপ্রাসাদের সামনে খোলা রঙ্গালয় এবং ক্রীড়াকৌশল দেখার জন্যে বিশাল গোলাকার বসবার জায়গা ছিল। এখানে হাজার হাজার লোক এক সঙ্গে বসে ক্রীড়া-কৌতুক দেখতে পারত। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রঙ্গশালাগুলোকে "হিপোড্রাম" বলা হত। এটা দেখতে রোমের কোলোসিয়ামের মত। এখানে পশু বা মানুষের নৃশংস ক্রীড়াগুলো দেখান হত না। রথ চালনার প্রতিযোগিতাই ছিল বাইজাণ্টিয়ামের সবচেয়ে বড়

আমোদ। এ নিয়ে অনেক সময় দলাদলির সৃষ্টি হত এবং অবস্থা আয়ত্তে আনতে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে হত।

বিদ্যাচর্চার জন্যেও বাইজাণ্টিয়াম্ নগরীর খ্যাতি বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত এখানে গ্রীক ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও গ্রীক ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। জাস্টিনিয়ান রাজপ্রাসাদের মধ্যেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে অষ্টম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে অন্ধকারের যুগ পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় এবং তার পরেও বাইজাণ্টিয়াম্ নগরী বিদ্যাচর্চার দীপ্তিতে আলোকিত থাকত। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে বাইজাণ্টিয়ামের সরকারী ভাষা ছিল ল্যাটিন। তাঁর মৃত্যুর পরে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য একটা পূর্ণ গ্রীক রাজ্যে পরিণত হল। জনসাধারণের ভাষা হল গ্রীক এবং পণ্ডিত-গণ গ্রীক ভাষায় বই লিখলেন।

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সামরিক সংগঠন উন্নত ধরণের ছিল। প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে সম্রাটের বিপুল বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এশিয়া মাইনর, আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ কৌশল শেখানো হত। নৌবাহিনীও ছিল বিশাল। বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ ছিল। তাদের আক্রমণের প্রধান অস্ত্র ছিল "গ্রীক অগ্নি"। একটা পাত্রে আগুন পুরে উহা শত্রুর জাহাজে নিক্ষেপ করা হত, অমনি শত্রুর জাহাজে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যেত। যুদ্ধের অন্যান্য উন্নত উপকরণ এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হত।

বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের পতন ঃ বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের বাইরে জাঁকজমক ও আড়ম্বর অনেক দিন চলেছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একাদশ শতাব্দী থেকে বাই-জাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূত্রপাত হয়েছিল। পারসিক, আরব ও তুর্কী জাতির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করার ফলে বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের শক্তি ক্ষয় হয়। অতিরিক্ত কর ধার্য করে জাস্টিনিয়ান্ সাম্রাজ্যকে নিঃস্ব এবং দুর্বল করে ফেলেছিলেন। এর প্রভাব সামরিক বাহিনীর উপর পড়ে। সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও দক্ষতা দিন দিন কমতে থাকে। বেলিসেরিয়াসের মত যোগ্য সেনাপতিদের অভাবে সীমান্ত সুরক্ষিত ছিল না। জাস্টিনিয়ান্ নিজে সৈন্যবাহিনীর বেতন ও অন্যান্য খরচ দিতেন না। তাঁর পরবর্তীকালে যোগ্য সম্রাটের অভাব দেখা দিয়েছিল। ধর্ম নিয়ে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। রাজপ্রাসাদে অনেক দল ছিল। তারা সম্রাটকে অপসারণের জন্যে ষড়যন্ত্র করতেন এবং ঘন ঘন সম্রাট বদল করতেন। তাছাড়া, মন্ত্রী, সামন্ত রাজা এবং রাজানুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পর প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ ছিল। তাদের দৃষ্টি প্রতিপত্তি লাভের দিকে ছিল। এসব আভ্যন্তরীণ কারণে বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য দুর্বল ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। পারস্য সেনা মিশর, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর দখল করে নিল এবং জার্মান উপজাতিরা দখল করল রোম। এ অবস্থায় কয়েক শতাব্দী বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য কোন রকমে টিকে ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কীরা বাইজাণ্টিয়াম্ আক্রমণ করল। বাইজাণ্টিয়াম্ সম্রাট পরাজিত হলেন। অটোম্যান তুর্কীরা বাইজাণ্টিয়াম্ (কন্স্ট্যাণ্টি-নোপল) দখল করে নিল।

তবুও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে সুদীর্ঘ এক হাজার বছর প্রাচীন রোমান-গ্রীক-সভ্যতা সংরক্ষণ করেছিল বলে বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

ঘটনাপঞ্জী

৩৩০ খ্রীঃ অঃ—বাইজাণ্টিয়ামে রাজধানী স্থাপন ও কনস্টাণ্টিনোপল নাম ধারণ

৫২৭ খ্রীঃ অঃ—জাস্টিনিয়ানের সিংহাসন আরোহণ

১৪৫৩ খ্রীঃ অঃ—তুর্কী জাতি কর্তৃক কন্‌স্টাণ্টিনোপল দখল এবং বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের পতন

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানীর নাম কি?

২। কার নাম অনুসারে বাইজাণ্টিয়ামের নাম হল কন্‌স্টাণ্টিনোপল?

৩। কত সালে নতুন রাজধানীর নাম হল কনস্টাণ্টিনোপল?

৪। জাস্টিনিয়ান্ কত বছর রাজত্ব করেছিলেন?

৫। জাস্টিনিয়ানের আইনাবলীর গুরুত্ব কি?

৬। তিনি কোন্ গির্জা স্থাপন করেন?

৭। বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন?

৮। সৈন্যবাহিনীর প্রধান আগ্নেয় অস্ত্র কি ছিল?

৯। বাইজাণ্টিয়ামের রঙ্গশালাকে কি বলা হত?

১০। কত সালে বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। বাইজাণ্টিয়ামের নাম কন্‌স্টাণ্টিনোপল হল কেন?

২। 'জাস্টিনিয়ান কোডে'-র বিষয়বস্তু ছিল কি?

৩। জাস্টিনিয়ানের জীবনের লক্ষ্য কি ছিল?

৪। বেলিসেরিয়সের কৃতিত্ব ও শেষ জীবন আলোচনা কর।

৫। জাস্টিনিয়ামের আইনাবলীর গুরুত্ব কি?

৬। বাইজাণ্টিয়ামের সঙ্গে কোন্ কোন্ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত?

৭। কোন্ কোন্ দেশ নিয়ে বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্য গঠিত?

৮। বাইজাণ্টিয়ামে কিভাবে রেশম শিল্প গড়ে ওঠে?

৯। বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের সামরিক সংগঠন কিরূপ ছিল?

১০। সেণ্টসোফিয়া গির্জার বর্ণনা দাও।

১১। বাইজাণ্টিয়ামে জনসাধারণের জন্যে ক্রীড়া-কৌতুকের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সমরবিজেতা ও আইনপ্রণেতা হিসেবে কৃতিত্ব আলোচনা কর।

২। বাইজাণ্টিয়াম্ নগরের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা দাও।

৩। বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের পতন কি কি কারণে ঘটল?

পঞ্চম অধ্যায়

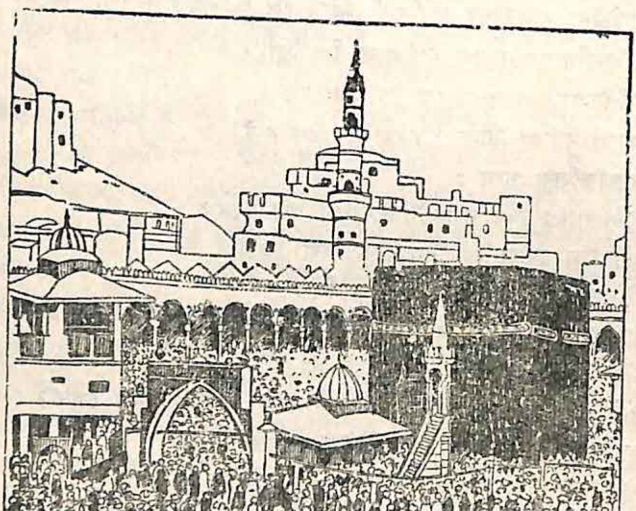
ইসলাম ও উহার প্রভাব

হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরব ও উহার অধিবাসী

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ছয়শো বছর পরে যখন উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছিলেন সে সময় আরবে এক নতুন ধর্মমতের অভ্যুদয় হয়েছিল। আরব দেশের প্যালেস্টাইন অঞ্চলে ইতিপূর্বে খ্রীষ্টান ও ইহুদি ধর্ম প্রচলিত ছিল। তৃতীয় যে নতুন ধর্ম আরব দেশে দেখা দিল তার নাম ইসলাম। যিনি এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাঁর নাম হজরত মহম্মদ।

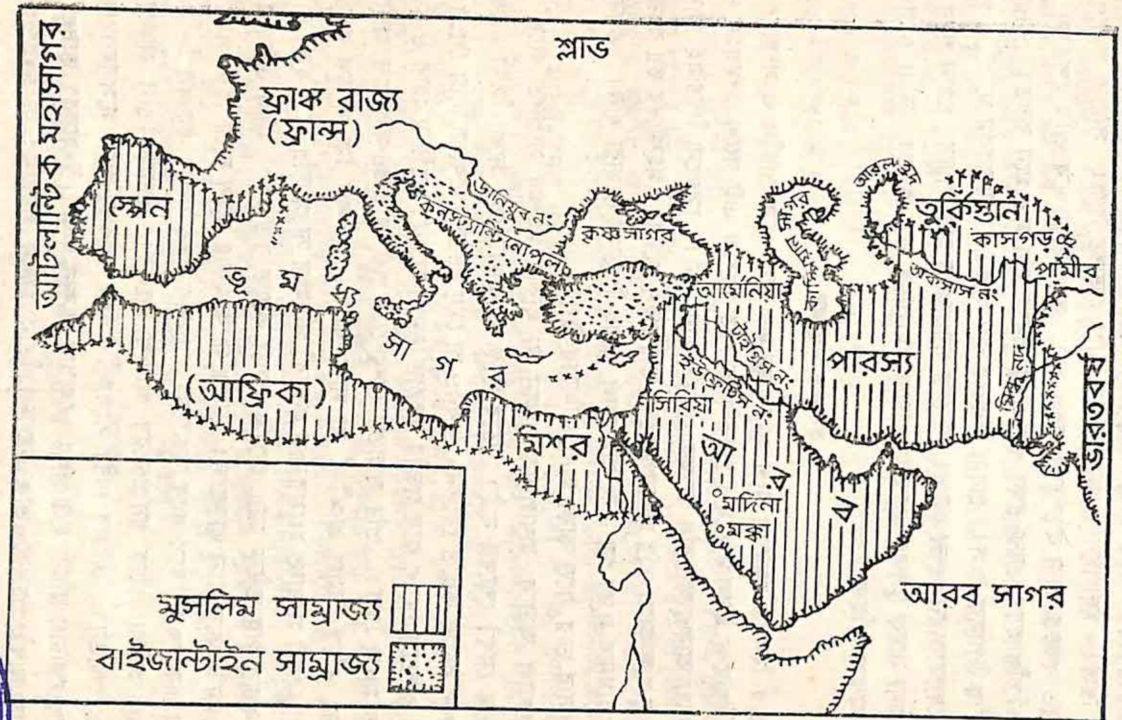
লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যস্থলে আরবদেশ অবস্থিত। আরব-দেশের অধিকাংশই মরুভূমি। ওর মাঝে মাঝে মরু-উপত্যকা ও মরূদ্যান আছে, আর আছে কয়েকটি নগরী। আরব হল সুমেরীয়, ব্যাবিলোনীয়, আসিরীয় ও ফিনিশীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। কালক্রমে এসব সভ্যতার কেন্দ্রগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু আরব-সভ্যতা অজও বেঁচে আছে। মুসলমানেরাই এই সভ্যতা বহন করে চলেছে।

প্রাচীনকালে আরবে বহু সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটলেও মহম্মদের জন্মকালে আরবদেশ তেমন সভ্য ছিল না। আরবের অধিবাসীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।



মক্কার মহাপবিত্র কাবা

এক শ্রেণী শহর নির্মাণ করে স্থায়িভাবে বসবাস করত। এদের সংখ্যা কম। অন্য শ্রেণীর কোন স্থায়ী বসতি ছিল না। তারা ছিল বেদুইন। তারা তাঁবুতে বাস করত। উঠ, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া পুষত, ব্যবসা-বাণিজ্য করত, আবার প্রয়োজনমত লুটতরাজ করত। উটের মাংস, খেজুর এবং দুধ ছিল তাদের খাদ্য। প্রত্যেকটি দল একজন দলপতির অধীনে বাস করত। দলগুলো সংখ্যায় খুব বড় হলে উপজাতি


আটলান্টিক মহাসাগর
শ্লাভ
ফ্রাঙ্ক রাজ্য
(ফ্রান্স)
স্পেন
ভূ ম
সা
গ
র
(আফ্রিকা)
মিশর
কৃষ্ণসাগর
আর্মেনিয়া
সিরিয়া
আ
র
ব
মদিনা
মক্কা
পারস্য
তুর্কিস্থান
কাসগড়
পামীর
ভারতবর্ষ
আরব সাগর
মুসলিম সাম্রাজ্য
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

(কৌম) নামে অভিহিত হত। উপজাতি বা কৌমগুলোর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত।

স্বভাবের দিক দিয়ে বেদুইনরা নির্ভীক, রুক্ষ, হঠকারি, কষ্টসহিষ্ণু ও রক্ত-পিপাসু ছিল। মদ্যপানে ও জুয়াখেলায় তারা অভ্যস্ত ছিল। সামান্য কারণে যুদ্ধ ও রক্তপাত করতে তারা ইতস্ততঃ করত না। তবে তারা খুব অতিথিপরায়ণ ছিল। শত্রুও অতিথি হলে তাকে রক্ষা করা তারা ধর্মকার্যের মত মনে করত। তারা বহু দেব-দেবীর উপাসক ছিল। প্রধান দেবতার নাম আল্লা। নানারকম মূর্তি ও প্রস্তর-খণ্ডকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। তাদের তীর্থস্থান হল আরবের প্রধান শহর মক্কা। মক্কার কাবা নামক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরকে তারা মহাপবিত্র মনে করত। কাব্য ও সংগীতে তাদের অনুরাগ ছিল।

হজরত মহম্মদ

মক্কার বিখ্যাত কোরেশ বংশ আরব জাতির মধ্যে খুব প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ছিল। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুল্লা তাঁর জন্মের পূর্বেই মারা যান। সেজন্যে পিতামহ আবদুল্লা মুতালিব বাল্যকালে তাঁর লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। মহম্মদের ছয় বছর বয়সে মাতা আমিনার মৃত্যু হয় এবং অল্পকাল পরেই পিতামহও মারা যান। তখন তাঁকে দেখাশোনার ভার পড়ে কাকা আবুতালিবের উপর।

সেকালে আরবে লেখাপড়ার প্রচলন না থাকায় মহম্মদ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেও লেখাপড়া বেশী শেখেন নাই। তবে কাকা আবুতালিবের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে দূর দেশে ব্যবসা করতে যেতেন। কখনও বা মেষ চরাতেন এবং সুযোগ পেলে বিশাল নির্জন প্রান্তরে প্রবেশ করে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতেন। তাঁর ব্যবহার ও কথাবার্তা অত্যন্ত মধুর ছিল। তাঁর সত্যতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি চরিত্র-মাধুর্যের জন্যে মক্কার লোকেরা তাঁকে "আল আমীন" বা সাধু বলত। চব্বিশ কি পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজা নাম্নী সম্ভ্রান্ত বংশের এক ধনবতী মহিলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। খাদিজাকে বিয়ে করার পর তাঁকে আর অর্থের চিন্তা করতে হত না। ফলে একমনে অবসর সময়ে ধর্মচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। মাঝে মাঝে মক্কার অল্প দূরে হিরা পর্বতে গিয়ে নির্জন এক স্থানে বসে ধ্যান করতেন। চল্লিশ বছর বয়সে একদিন তিনি শুনতে পেলেন, আল্লা তাঁকে ধর্মপ্রচারের আদেশ দিলেন। প্রায়ই তিনি আল্লার বাণী শুনতে পেতেন। এইসব বাণী সংগৃহীত হয়ে পরবর্তীকালে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণ রচিত হয়েছিল। কোরাণ শব্দের অর্থ (ঈশ্বরের) ভাষণ। মহম্মদ আল্লার বাণী প্রচারের ভার নিলেন। তিনি হলেন পয়গম্বর বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ।

মহম্মদ মক্কা নগরীতে নতুন ধর্মমত প্রচারের সময় তাঁর স্ত্রী, জামাতা আলি, বন্ধু আবুবকর এবং বিশিষ্ট অনুগামী ওমর ছাড়া আর কেউ এই ধর্মমত গ্রহণ করলেন না। মক্কাবাসীদের বেশীর ভাগ লোক, এমন কি কোরেশ বংশের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিগণ মহম্মদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁরা মহম্মদ ও তাঁর অনুগামীদের ওপর নানারকম অত্যাচার করায় ৬২২ খ্রীঃ অঃ মক্কা ছেড়ে মদিনায় পালিয়ে গেলেন। এই পলায়নকেই আরবী ভাষায় 'হিজিরৎ' বলা হয়। তাই ৬২২ খ্রীঃ অঃ থেকে মুসলমানেরা হিজিরা সন গণনা করেন। মদিনার লোকেরা কিন্তু মহম্মদকে সেখানকার রাজা ঘোষণা করলেন। নতুন ধর্ম জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ল। উপাসনার জন্যে মদিনায় মসজিদ নির্মিত হল। অবশেষে তিনি ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪০০ জন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমি মক্কায় হাজির হলেন। মক্কাবাসীরা বাধা দেওয়ায় যুদ্ধ শুরু হয় এবং তাতে মহম্মদ জয়ী হন। অতঃপর তিনি নগরীতে প্রবেশ করে কাবা মন্দিরের মূর্তিগুলি ভেঙে ফেললেন। পরাজিত শত্রুদের ক্ষমা করলেন। ধীরে ধীরে মক্কাতেও তাঁর নবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। মহম্মদ তখন চীন, রোম, পারস্য প্রভৃতি দেশেও তাঁর দূত পাঠালেন। তিনি যে ধর্ম প্রচার করলেন এর নাম হল ইসলাম ধর্ম। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম ধর্মের কথা জানা যায় আল্লার প্রেরিত সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ কোরাণ থেকে। ইসলাম শব্দের অর্থ "ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন"। এই ধর্মের মূল কথা—লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লা এক এবং মহম্মদুর্ রসুলুল্লাহ অর্থাৎ মহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ। ইসলাম ধর্ম যাঁরা অনুসরণ করবেন তাঁরা মুসলমান বলে পরিচিত হবেন। মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী ; তারা মূর্তিপূজা বা বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। কোরাণ অনুসারে পাঁচটি ধর্ম-কার্য মুসলমানদের অবশ্য করণীয়। এইগুলো হচ্ছে—ইমান (বিশ্বাস) ; নামাজ (আল্লার উপাসনা) ; রোজা (রমজান মাসে উপবাস) ; জাকাৎ (দরিদ্রদিগকে ধনদান) এবং হজ (মক্কায় তীর্থযাত্রা)। মোটকথা মুসলমানকে দৈনিক নিয়মিত পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে, বছরে একবার রোজা করতে হবে, সামর্থ্য থাকলে মক্কায় অন্ততঃ একবার হজ করতে যেতে হবে এবং বছরের আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ দান করতে হবে। কোরাণে মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম মুসলমানদিগকে নিয়মানুবর্তিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার শিক্ষা দান করেছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে ধনী মুসলমান ও দরিদ্র মুসলমান, আমীর ও ফকির, রাজা ও প্রজা সকলেই সমান, ইসলাম সকল মুসলমানকে ভাই-এর মত দেখতে এবং একসঙ্গে মসজিদে নামাজ পড়তে বলেছে।

ইসলামের বিস্তার

মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের প্রচারের এবং আরব সাম্রাজ্য বিস্তারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন মহম্মদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা। তাঁরা খলিফা নামে পরিচিত। খলিফারা হলেন একদিকে ধর্মগুরু, অপরদিকে ইসলামের রাষ্ট্রনেতা। খলিফাদের মধ্যে প্রধান চারজন "ধর্মপ্রাণ খলিফা" বলে ইতিহাসে বিখ্যাত। এঁরা হলেন আবু-বকর, ওমর, ওসমান ও আলি।

খলিফাদের যুগেই ইসলামের দিগ্বিজয় আরম্ভ হয়েছিল। মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১০০ বছরের মধ্যে আরবগণ নতুন ধর্মের বলে বলীয়ান এবং একতাবন্ধ হয়ে পৃথিবীর বহুদেশ জয় করে সে সকল দেশে ইসলামধর্ম প্রচার করতে সমর্থ হয়েছিল। পূর্বদিকে ভারতের সিন্ধু প্রদেশ থেকে পশ্চিম দিকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত এক বিশাল আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তীর, ধনুক, তরবারি ও বল্লমে সজ্জিত আরবীয় পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের সামনে সেযুগে কোন দেশ যুদ্ধে দাঁড়াতেই পারল না। ফলে একে একে সমগ্র আরব, মিশর, ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্তী উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, আর্মেনিয়া, পারস্য, বর্তমান আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান, ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ, মধ্য-এশিয়ার খোরসান, তুর্কিস্থান ও ফরগনা প্রদেশ প্রভৃতি দেশগুলি আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আরব সাম্রাজ্য এশিয়া ছাড়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল।

আবুবকর

মহম্মদের কন্যা ফাতিমা ছাড়া অন্য কোন সন্তান জীবিত ছিল না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর আরবদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা হজরত আবুবকরকে ইসলামজগতের খলিফার পদে নির্বাচিত করেন। আবুবকর মহম্মদের কাছে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে এক অলৌকিক গল্প আছে। একদিন রাত্রে হজরত মহম্মদ "সবে মেরাজ" (ঊর্ধ্বলোক) গমন করে জ্যোতিঃস্বরূপ আল্লার দর্শন লাভ করেন। পৃথিবীতে ফিরে এসে তিনি আবুবকরকে তাঁর মেরাজ গমনের গল্প বলেন এবং সর্বপ্রথমে আবুবকরই উহা বিশ্বাস করে মহম্মদের কাছে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেন।

আবুবকর ৬৩২ খ্রীঃ অঃ হইতে ৬৩৪ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত খলিফার পদে ছিলেন। তাঁর শাসনকালে বেদুইনরা বিদ্রোহ ও ইসলাম ত্যাগ করে এবং সেই উপলক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করে। বৃদ্ধ আবুবকর ইসলামের এই বিপদে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে সমগ্র আরব দেশকে আবার ইসলামের পতাকাতলে আনয়ন করেন।

ওমর

আবুবকরের মৃত্যুর পর খলিফা হন ওমর। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে গল্প আছে যে তিনি প্রথম জীবনে ইসলামের শত্রু ছিলেন। মহম্মদ দেবদেবীর পূজার বিরুদ্ধে মত প্রচারকালে ওমর ক্রুদ্ধ হয়ে মহম্মদকে হত্যা করার জন্যে মুক্ত তরবারি নিয়ে মহম্মদের উদ্দেশে বাহির হলেন। পথে শুনলেন যে তাঁর ভগিনী ও ভগিনপতি ইতিমধ্যে ইসলাম ধম গ্রহণ করেছেন। উত্তেজিত ওমর তাদের বাড়ি উপস্থিত হয়ে ভগিনী ও ভগিনপতিকে অস্ত্রাঘাত করেন। কিন্তু প্রিয় ভগিনীর দেহ থেকে রক্তপাত হতে দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। ভগিনীর মুখ থেকে কোরাণের একাংশ পড়তে শুনে মুগ্ধ ওমর ছুটে গিয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে মহম্মদের কাছে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর থেকে ওমর মহম্মদের একজন প্রধান ভক্ত ও সহকর্মী হয়ে উঠলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। কথিত আছে যে, সামান্য যবের রুটি খেজুর ও জলপাইয়ের তেল ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। তিনি খেজুরপাতার শয্যায় শয়ন করতেন এবং মাত্র একটা কামিজ ও আলখাল্লা সারা বছর পরতেন। তিনি ছিলেন কঠোর চরিত্রের মানুষ। নৈতিক অধঃপতনের জন্যে তিনি আপন পুত্রের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন।

ওমর ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা। তাঁর নেতৃত্বে আরব সৈন্যবাহিনী পারস্য, জেরুজালেম, মধ্য এশিয়ার কিয়দংশ, মিশর এবং আফ্রিকার উত্তর ভাগের অনেক দেশ জয় করে।

ওসমান ও আলি

ওমরের পর ওসমান এবং তাঁর পরে আলি খলিফা হয়েছিলেন। তাঁরাও সরল জীবন যাপন করতেন। তাঁরা ধনসম্পদের প্রত্যাশী ছিলেন না। রাজকোষের অর্থ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করতেন না। তাই তাঁদের ধার্মিক খলিফা বলা হত। তাঁদের আমলেও বহুদেশ আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

কারবালার কাহিনী

আলির মৃত্যুর পর সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া খলিফা হলেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের সন্তান। তাঁর রাজধানী ছিল দামাস্কাস। কিন্তু মহম্মদের দৌহিত্র হাসান ও হোসেন মুয়াবিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। তিনি অর্থের প্রলোভনে হাসানকে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেই তাঁকে কারবালা যুদ্ধের আগেই হত্যা করা হয়। মুয়াবিয়ার পর খলিফা হন এজিদ। তিনি ছিলেন "এজিদে-পলিদ" অর্থাৎ পাপাত্মা এজিদ। আরবের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা অযোগ্য এজিদকে খলিফার পদ থেকে সরাবার জন্যে হোসেনের নেতৃত্বে এজিদের বিরুদ্ধে কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে এজিদ নিষ্ঠুরভাবে হোসেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও অন্য শিশুপুত্র এবং হাসানের পুত্র কাশেমকে হত্যা করেন। মরুভূমির প্রান্তরে বুকভরা তৃষ্ণা নিয়ে সকলেই মৃত্যুবরণ করেন (৬৮০ খ্রীঃ অঃ)। কারবালার এই করুণ কাহিনী "বিষাদ সিন্ধু" কাব্যে পাওয়া যায়। প্রতিবছর মহরম মাসে মুসলমানেরা বক্ষে করাঘাত করে কাঁদে "হায় হাসান! হায় হোসেন।" কারবালার শোচনীয় ঘটনার স্মরণে এই শোক-পর্বের নাম 'মহরম'।

এই যুদ্ধের ফলে মুসলমান সম্প্রদায় দুভাগে ভাগ হয়ে গেল—আলির অনুবর্তিগণ শিয়া এবং অপর মুসলমানেরা সুন্নী নামে পরিচিত হল।

আব্বাসীয় খলিফা বংশ

মহম্মদের কাকা আব্বাস আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি কৌশলে উমাইয়া বংশ লোপ করেন এবং বাগদাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫০ খ্রীঃ অঃ থেকে ১২৫৮ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত আব্বাসীয় বংশ খলিফা পদে ছিলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুন-অল-রশিদ। তাঁর আমলে আরব সভ্যতা উন্নতির চরমে

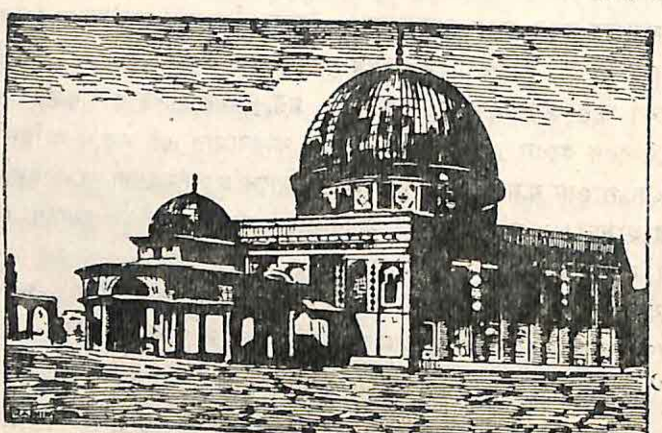
উঠেছিল। তৎকালে বাগদাদ ঐশ্বর্যে ও গৌরবে রোমের বাইজাণ্টিয়ামের সমকক্ষ ছিল। বিলাস-ব্যসনে, জাঁক-জমকে, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পে বাণিজ্য প্রসারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে হারুন-অল-রশিদের বাগদাদের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। হুনেন-ইবন্ ইশাক ছিলেন আব্বাসীয় খলিফাদের আমলের বিখ্যাত পণ্ডিত। হারুন-অল-রশিদের রাজত্বকাল আরবের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলে খ্যাতি-লাভ করেছে।

স্পেনে আরব শাসন ও কর্ডোভা

আরবীয়গণ স্পেন দেশেও এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। ঐশ্বর্যে ও সভ্যতা প্রচারে কনস্টাণ্টিনোপল এবং বাগদাদের পরেই কর্ডোভা স্থান পেয়েছিল। নালন্দার মত কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের ছাত্র এবং পণ্ডিতগণ এসে মিলিত হত। এখানে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। নগরে অসংখ্য এবং রাজবাড়ীতে সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার ছিল। এখানকার মসজিদ, অট্টালিকা, স্নানাগার ছিল অসংখ্য। কর্ডোভার নিকটেই ছিল জহরা প্রাসাদ। এই সুন্দর শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন লেখক বলেছেনঃ "এই শহর সমস্ত বিশ্বের অলঙ্কারস্বরূপ।" দক্ষিণ স্পেনে ছিল গ্রানাডা রাজ্য। গ্রানাডার বিখ্যাত আলহাম্‌রা প্রাসাদ আরব স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন। এই ধরনের নকশাকে আরাবেসক বা আরবী নকশা বলা হয়।

ইউরোপে আরবের অগ্রগতিতে বাধা

স্পেনে সাম্রাজ্য বিস্তারের পর আরবের গল বা ফ্রান্সে প্রবেশ করেছিল। ইউরোপের জাতিগুলি তখন আরবের বিরুদ্ধে একটা জোট পাকিয়ে আরবদের বাধা দিতে প্রস্তুত



জেরুজালেম শহরের পাহাড়ের উপর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মসজিদ—"ডোম অব্ দি রক"

হল। তাদের নেতা ছিলেন চার্লস মার্টেল। ৭৩২ খ্রীঃ অঃ টুরস্ নামক স্থানে তিনি আরববাহিনীকে পরাজিত করে আরবের অগ্রগতি ব্যাহত করেন। ঐতিহাসিকদের

মতে টুরস্-এর যুদ্ধে আরববাহিনী যদি পরাজিত না হত তবে ইউরোপের ইতিহাস ভিন্নরূপ হত। ইউরোপে হয়ত ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটত। তবে স্পেনে আরব আধিপত্য কয়েকশো বছর টিকেছিল। স্পেনের মুসলমানদের মুর বলা হত।

বিশ্বসভ্যতায় আরবদের দান

বিশাল আরব সাম্রাজ্যে ভারতীয়, চৈনিক, গ্রীক, রোমান, পারসিক, ইহুদী প্রভৃতি নানা সুসভ্য জাতি বাস করত। তাদের কাছ থেকে আরবীয়রা গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। তারা ভারতীয়দের কাছ থেকে সংখ্যা পদ্ধতি এবং বীজগণিত নিয়ে গিয়ে ইউরোপে প্রচার করে। ইউরোপের চিকিৎসাবিদ্যা আরবদের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। আরবেরা কাগজ নির্মাণ-কৌশল শিখেছিল। আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের উপরও আরবের প্রভাব দেখা যায়। আরবগণ গ্রীকদের দর্শন ও বিজ্ঞান নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করেন। শিল্প ও স্থপতিবিদ্যায় আরবেরা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে। ইউরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে আরবেস্ক নামক কারুকার্য শিক্ষা লাভ করে।

আরব সভ্যতার উৎকর্ষের যুগে যে সব পণ্ডিত জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান প্রচারে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে আবু সিনা, ইবন রুশদ, ইবন-খলদুন, অল-তাবারি, আলবেরুনী, ইবন্ বতুতা, আলকিন্দি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

আবু সিনা

ইনি দর্শন, চিকিৎসা, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র এবং শিল্প বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ সকল বিষয়ে প্রায় ১০০ খানা বই লিখেছিলেন।

ইবনে রুশদ

ইনি জ্যোতিষ ও চিকিৎসা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। এ্যারিস্টটলের দর্শনের বিখ্যাত ভাষ্য ইনি আরবী ভাষায় রচনা করেন। তিনি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন।

ইবন খলদুন

ইনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি সমাজ ও অর্থনৈতিক-বিজ্ঞানের আলোচনার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

আল-তাবারি

ইনিও বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি একখানা পৃথিবীর ইতিহাস সংকলন করেন। তিনি কোরাণের বিখ্যাত টীকা রচনা করে যশের অধিকারী হয়েছেন।

অলবেরুনী

ইনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। ইনি ভারতে এসে হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং ভারতের বিবরণ রচনা করেন।

ইবন বতুতা

ইনি আফ্রিকাবাসী একজন পর্যটক। ইনি বহুদেশ ভ্রমণ করে ভারতে আসেন এবং একটা মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন।

আলকিন্দি

ইনি একজন আরবীয় পণ্ডিত। ইনি দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে ২০০ খানা গ্রন্থ রচনা করেন।

ঘটনাপঞ্জী

৫৭০ খ্রীঃ অঃ—মহম্মদের জন্ম। ৬২২ খ্রীঃ অঃ—হিজিরৎ। ৬৩২ খ্রীঃ অঃ—মহম্মদের মৃত্যু। ৬৮০ খ্রীঃ অঃ—কারবালার যুদ্ধ। ৭১১ খ্রীঃ অঃ—আরবের স্পেন জয়। ৭৩২ খ্রীঃ অঃ—টুরসের যুদ্ধে আরবের পরাজয়।

অনুশীলনী

১। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?
২। হজরত মহম্মদ কত সালে জন্মান?
৩। হজরত মহম্মদ কাকে বিয়ে করেন?
৪। কত খ্রীষ্টাব্দ থেকে হিজিরা সন গণনা করা হয়?
৫। কোরাণ শব্দের অর্থ কি?
৬। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?
৭। কারবালার যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল?
৮। কারবালার ঘটনা কোন্ গ্রন্থ থেকে জানা যায়?
৯। কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের কোন্ উৎসব পালিত হয়?
১০। আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী কোথায় ছিল?
১১। আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা কে ছিলেন?
১২। ইবন ইশাক কে ছিলেন
১৩। স্পেনের রাজধানীর নাম কি?
১৪। স্পেনের মুসলমানদের কি বলা হত?
১৫। ইউরোপে আরবের অগ্রগতিতে কে বাধাদান করেন?
১৬। ইউরোপীয়রা আরবের কাছ থেকে কোন্ শিল্প শেখে?
১৭। ইবন্ বতুতা কে ছিলেন?
১৮। আরবেরা কত সালে স্পেন জয় করে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। আরবে কোন্ কোন্ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?
২। হজরত মহম্মদের বংশ পরিচয় দাও।
৩। হজরত মহম্মদের বাল্যজীবন সম্পর্কে কি জান?
৪। কোন্ ঘটনা থেকে হিজিরা সন গণনা করা হয়?
৫। মহম্মদ কোন্ কোন্ দেশে মুসলিম ধর্ম প্রচার করেছিলেন?

৬। মহম্মদকে আল-আমীন বলা হত কেন?
৭। কোন্ কোন্ খলিফার আমলে ইসলামের প্রসার ঘটে?
৮। খলিফা কাকে বলা হয়?
৯। ওসমান ও আলিকে ধার্মিক খলিফা বলা হত কেন?
১০। কখন থেকে মুসলমানরা কি কি ভাগে বিভক্ত হয়?
১১। শিয়া ও সুন্নী কাদের বলা হয়?
১২। হারুণ-অল্-রশিদের আমলে বাগদাদের গৌরব কিরূপ ছিল?
১৩। মুসলমানদের আমলে স্পেনের খ্যাতি কিরূপ ছিল?
১৪। ইউরোপে ইসলাম ধর্মের অধিক প্রসার ঘটে নাই কেন?
১৫। মধ্যযুগে আরবের কয়েক জন পণ্ডিতের নাম লিখ।
১৬। খলিফা এজিদকে "পালিদে এজিদ" বলা হয় কেন?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। আরব ও আরবীয়দের সম্বন্ধে কি জান লিখ।
২। মহম্মদ কিভাবে মদিনা ও মক্কায় মুসলমান ধর্ম প্রচারিত করেন?
৩। ইসলাম ধর্মের মূল কথা কি? মুসলমানদের করণীয় কি কি?
৪। কিভাবে, কোথায় ইসলামের বিস্তার ঘটে?
৫। কারবালা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা দাও।
৬। বিশ্ব-সভ্যতায় আরবের অবদান আলোচনা কর।

বামদিকের যে কথাটার সঙ্গে ডানদিকের যে নম্বরের উক্তিটা প্রয়োগ করা যায় সে নম্বরটা বন্ধনীর মধ্যে লেখঃ—

(ক) কর্ডোভা	( )	১। মুসলমানদের পর্ব
(খ) আলবিরুনী	( )	২। মুসলিম বর্ষ
(গ) ইবন বতুতা	( )	৩। বিখ্যাত খলিফা
(ঘ) মহরম	( )	৪। আফ্রিকাবাসী পর্যটক
(ঙ) ওমর	( )	৫। কারবালাকাহিনী মূলকগ্রন্থ
(চ) হিজিরৎ	( )	৬। স্পেনের রাজধানী
(ছ) আলতাবারি	( )	৭। আরবীয় পণ্ডিত
(জ) বিষাদ সিন্ধু	( )	৮। আরবীয় ঐতিহাসিক

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

(ক) শার্লেমেন

যে সব জার্মান জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল, তাদের অন্যতম শক্তিশালী শাখা ফ্রাঙ্ক উপজাতি বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কিছুটা অংশ নিয়ে ফ্রাঙ্ক রাজ্য স্থাপন করেছিল। ফ্রাঙ্ক রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হয়েছিলেন শার্লেমেন (৭৬৮ খ্রীঃ অঃ—৮১৪ খ্রীঃ অঃ)। ইনি বাগদাদের বিখ্যাত আব্বাসীয় খলিফা হারুন্-অল্-রসিদের সমসাময়িক ছিলেন। তৎকালের পণ্ডিত আইনহার্ডের লেখা জীবনী-গ্রন্থ থেকে শার্লেমেন বা মহান চার্লসের কথা জানা যায়।

শার্লেমেনের বর্ণনা

শার্লেমেন ছিলেন প্রায় ৭ ফুট লম্বা ও সুগঠিত দেহের অধিকারী। শরীরে অসাধারণ



শার্লেমেন

শক্তি। তাঁর চোখ ছিল খুব উজ্জ্বল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, উচ্চ নাসিকা এবং লম্বা দাড়ি। তিনি ফ্রাঙ্কদের জাতীয় পোষাক পরতেন। তাঁর সোনার কোমরবন্ধে সোনার হাতল-ওয়ালা তরবারি ঝুলত। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন; সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি কর্মচারী ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করতেন। তিনি রসিকতা

ভালবাসতেন। তাঁর সব বিষয় জানার খুব আগ্রহ ছিল। সেইজন্য সবাইকে নানাবিধ প্রশ্ন করতেন।

সাম্রাজ্য

শার্লেমেন বীর যোদ্ধা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পঞ্চাশটি অভিযান পরিচালনা করে এক সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমান ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, জার্মানির অধিকাংশ, ইটালী ও স্পেনের উত্তরাংশ, সুইজারল্যাণ্ড, কর্সিকাদ্বীপ—এই দেশগুলি শার্লেমেনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত শ্লাভ জাতীয় (বর্তমান রুশ জাতির) রাজ্যগুলি তাঁকে কর দিত। তিনি স্যাকসন, মূর, আভার জাতিগুলির বিরুদ্ধে নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি, রোলাণ্ড যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, সেই কাহিনী নিয়ে "রোলাণ্ড গীতি" রচিত হয়েছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে চারণ কবিরা এই গীতি গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াত।

শার্লেমেনের অভিষেক ও ইহার গুরুত্ব

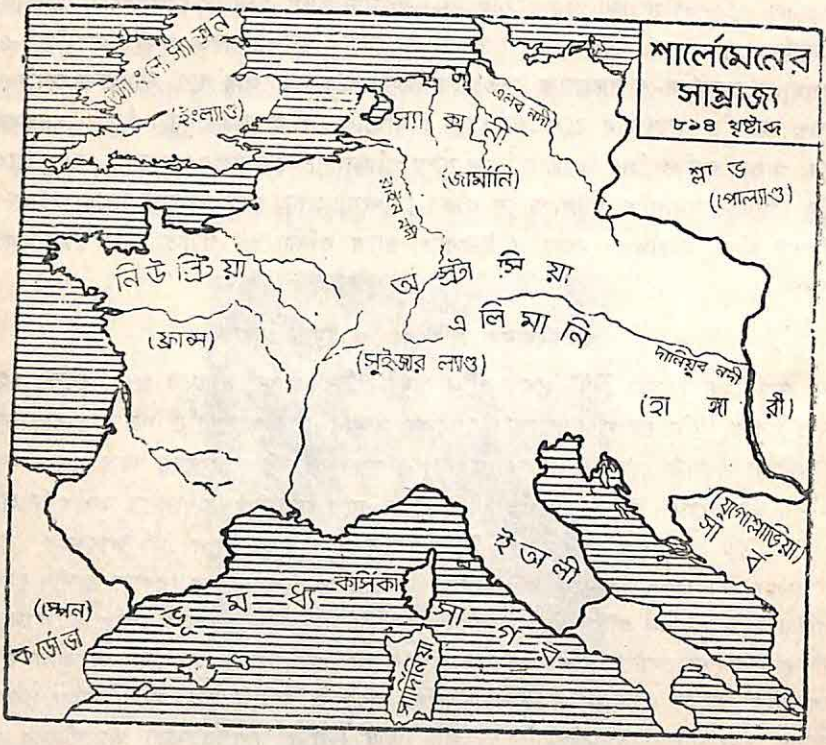
শার্লেমেন ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। খ্রীষ্টান ধর্ম জগতের প্রভু ছিলেন মহামান্য পোপ, ইনি রোমে থাকতেন। পোপের সম্মান এবং ভূসম্পত্তি বজায় রাখার জন্য শার্লেমেন সর্বদাই চেষ্টা করতেন। কেননা, এ সময় রোমের লোকেদের কাছে পোপ বড়ই অপ্রিয় হয়েছিলেন। পোপ রোম থেকে বিতাড়িত হয়ে শার্লেমেনের দরবারে আশ্রয় নিলেন। সম্রাট তাঁকে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু পোপ এই উপকারের কথা ভুললেন না। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বড় দিনের উৎসবের সময় শার্লেমেন রোমের প্রাচীন সেণ্ট-পিটার গির্জায় যখন হাঁটু গেড়ে উপাসনায় রত ছিলেন, হঠাৎ মহামান্য পোপ শার্লেমেনের মাথায় একখানা সোনার রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন এবং রোমান সম্রাটেরা যে লাল জামা (গাউন) পরতেন, সেরকম জামা শার্লেমেনের গায়ে জড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনগণ বলে উঠল—"মহামহিমান্বিত রোম সম্রাট চার্লস্ (শার্লেমেন) অগাস্টাসের জয় হোক।" সেদিন থেকে শার্লেমেনের সাম্রাজ্যকে বলা হয় "হোলি রোমান এম্পায়ার" অর্থাৎ "পবিত্র রোমান-সাম্রাজ্য।"

ইউরোপের ইতিহাসে শার্লেমেনের অভিষেকের গুরুত্ব

রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর কয়েক শো বছর পার হয়ে গিয়েছে, "রোম সম্রাট" উপাধি পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সেই অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। জনসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মাল যে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের আবার উদ্ভব হয়েছে, যদিও এই সাম্রাজ্য ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবিক পক্ষে, শার্লেমেনের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ছিল ফ্রাঙ্কদের প্রতিষ্ঠিত এক নতুন সাম্রাজ্য।

তবুও শার্লেমেনের এই অভিষেক তৎকালীন ও পরবর্তী বহু শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। পূর্বে তাঁর রাজক্ষমতা ফ্রাঙ্ক ও লম্বার্ডগণের

নির্বাচনের উপর নির্ভর করত। এই অভিষেক অনুষ্ঠানের পর তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি পোপের দ্বারা রাজমুকুট পরিহিত এবং প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হলেন। এর ফলে ভবিষ্যতে তিনি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় সব বিষয়ের সর্বময় কর্তা হলেন। তিনি নিজেকে খ্রীষ্টান জগতের এবং চার্চের রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা করলেন।



তিনি বিশপদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করলেন এবং ধর্মীয় সভ্য ও সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে থাকলেন। তিনি কেবলমাত্র কন্স্টাণ্টাইন্ ও থিয়োডোসিয়াসের নয়, প্রাচীন ইস্রায়েলের ডেভিড, যোশিয়ার ক্ষমতার উত্তরাধিকারী বলে নিজেকে ভাবতে লাগলেন। তিনি সাধারণ ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতিটা ব্যক্তির রোমান সম্রাটের নামে আনুগত্য আদায় করতে থাকেন। তাঁর আদেশ বলে বারো বছর বা তার বেশী বয়সের প্রত্যেক নাগরিককে শপথ করতে হবে যে, সে সম্রাট ও তাঁর আইন মেনে চলবে, তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সম্রাটের সেবা করবে এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে তাঁর সাম্রাজ্যে শান্তিতে বাস করবে। এই মর্মে তিনি আইন জারি করলেন যে, প্রজারা চুরি, অত্যাচার ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে, বিধবা বা শিশুর উপর কোন অত্যাচার করবে না, চার্চ বা যাজকদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করবে না। এই সব আইন যে ভঙ্গ করবে এবং সম্রাটের বিরুদ্ধাচারণ করবে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

রাজশক্তি ও যাজকশক্তির সহিত সম্পর্ক

"পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য" কথাটাই মধ্যযুগের সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করল। রাজশক্তির সঙ্গে পোপের যে মনোমালিন্য ও বিদ্বেষভাব ছিল তা দূর হল। শার্লেমেন নতুন রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন। তিনি পোপ তৃতীয় লিওকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি হলেন সমস্ত চার্চের রক্ষাকর্তা ও পরিদর্শক। রাজশক্তি ও যাজকশক্তির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলে খ্রীষ্টান জগতে ঐক্য স্থাপন করলেন। তাছাড়া, শার্লেমেনের অভিষেক ইউরোপে নতুন যুগের সূচনা করল। বর্বর যুগের অবসান হল। রাজনীতির উপর খ্রীষ্টান জগতের আদর্শের প্রভাব পড়ল। ঈশ্বরের অভিষিক্ত এক সম্রাটের অধীনে যেমন বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হল তেমনি রোমের এক মঠাধ্যক্ষের অধীনে সমগ্র চার্চ স্বীকৃত হল। পোপের হাতে থাকবে স্বর্গ ও নরকের চাবিকাঠি। তিনি শুধু সম্রাটকে আপন পথে চলতে নিয়ন্ত্রিত করবেন।

শার্লেমেনের মহত্ব ঃ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

শার্লেমেন জাতিতে ফ্রাঙ্ক হলেও প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধারের আশা করতেন। তিনি রাইন নদীর তীরে অ্যাকেন নগরে যে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন তাকে "নতুন" রোম নাম দিয়েছিলেন। তিনি ইটালীর উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত রাভেনা নগর থেকে মূল্যবান মর্মর পাথর ও শিল্পী এনে নিজের জন্যে অ্যাকেন নগরে সুন্দর প্রাসাদ ও গির্জা নির্মাণ করেন এবং সেগুলি মোজেইক চিত্রে অলংকৃত করেন। রোম নগর থেকেও স্তম্ভ, মূর্তি ও অন্যান্য বস্তু অ্যাকেন নগরে আনা হয়েছিল। সেকালে শার্লেমেনের প্রাসাদ ইউরোপের এক বিখ্যাত দর্শনীয় বস্তু হয়েছিল। তিনি অষ্ট্রিয়াতে আরো যে দুটো প্রাসাদ নির্মাণ করেন তা রোমান স্থাপত্যের নিদর্শন। তিনি মেঞ্জে পাঁচশো গজ দীর্ঘ এক সেতু নির্মাণ করান এবং দানিয়ুব ও রাইন নদীকে খাল খনন করে যুক্ত করান।

শার্লেমেন নিজে নিরক্ষর হলেও শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর সভার গৌরব ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত আলকুইন এবং লম্বার্ডির পিটার ও পল। শার্লেমেন রাজপ্রাসাদের মধ্যেই যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, আলকুইন ছিলেন তার অধ্যক্ষ। আলকুইন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে রাজ্যে শার্লেমেন অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাকরণ, দর্শন ও বিজ্ঞান পড়ান হত এবং যারা এখানে শিক্ষালাভ করত তারা পুরোহিত হয়ে ধর্মপ্রচার করে বেড়াত। শার্লেমেনের কাছে ধর্মযাজকেরা যেসব চিঠিপত্র পাঠাতেন তাতে ব্যাকরণগত অনেক ভুল থাকত। তাই যাজকদের শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মহান চার্লসের আমলে মঠ-গুলো ছিল শিক্ষার কেন্দ্রস্থল, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস, ব্যাকরণ, কাব্য, জীবনীগ্রন্থ প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। বহু স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিত তাঁর রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেছিলেন। শার্লেমেনের রাজসভার গৌরব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রশিদ শার্লেমেনের দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন। এই দূতের সঙ্গে

তিনি একটা হাতী ও অদ্ভুত ধরনের একটা ঘড়ি উপহার পাঠিয়েছিলেন। ঘড়িটার আকার ছিল বিরাট। আর এতে এমন কৌশল ছিল যে ঘণ্টা বাজবার সময় হলে ঘড়ির ভিতর থেকে পুতুল বার হয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে যেত। কর্ডোভার আরব খলিফা এবং কনস্টাণ্টিনোপলের রোমান সম্রাটও শার্লেমেনের রাজসভায় দূত পাঠিয়েছিলেন।

শার্লেমেন সাম্রাজ্যে শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্যে নিজে যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন। স্যাকসনি, ইটালী অথবা ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি প্রদেশে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি এক দল পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন যারা সমস্ত সাম্রাজ্য ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতেন এবং সম্রাটকে প্রত্যেক প্রদেশের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সব খবর জানাতেন। এই কর্মচারী-দের বলা হত "মিসিডোমিনিকি" (রাজপ্রতিনিধি)। তাছাড়া, গোপন রাজকর্মচারীর দ্বারা জেলার অধিবাসীদের, কাউন্টদের, বিশপদের এমনকি পরিদর্শকদেরও খবর নিতেন। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের সংবাদ পেলে তাকে দরবারে ডেকে এনে কৈফিয়ৎ তলব করতেন।

শার্লেমেন ছিলেন খ্রীষ্টধর্মের প্রবল অনুরাগী। কিন্তু তাঁর প্রতিবেশী স্যাকসন জাতি ছিল এই ধর্মের ঘোর বিরোধী। তারা খ্রীষ্টান যাজকদের হত্যা করত এবং তাদের গির্জা পুড়িয়ে ফেলত। শার্লেমেন তাদের বিরুদ্ধে বার বার যুদ্ধ করে তাদের দমন করেন এবং একবারে পাঁচ হাজার বন্দী স্যাকসনকে হত্যা করার আদেশ দেন। এই হত্যাকাণ্ডে তাদের মনে এমন ভয় হল যে তারা শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

ইউরোপের সপ্তম শতাব্দীর সেই অন্ধকার যুগে শার্লেমেন সভ্যতার আলোক জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। তিনি পশ্চিম জগৎকে নতুন ও মহান আদর্শের যে আলোক দান করেছিলেন, তা বর্বর সম্রাটদের দ্বাদশ পুরুষের শাসনকালে অথবা তাদের পূর্বে প্রাচীন রোমে অজ্ঞাত ছিল। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর রাজত্বকালকে মধ্যযুগের "সুবর্ণযুগ" বলা চলে। কিন্তু শার্লেমেনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশের রাজাদের সঙ্গে পোপদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘকাল চলেছিল। ফলে ফ্রাংক সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এবং এই সাম্রাজ্যের ধ্বংস থেকেই বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানী গড়ে ওঠে।

(খ) মধ্যযুগে ইউরোপের জীবনযাত্রা

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টানদের উপাসনার জন্যে বহু গির্জা বা ভজনালয় নির্মিত হত। সেকালে এসব ভজনালয়ের পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় এবং তাদের প্রতিষ্ঠান ক্যাথলিক চার্চের প্রতাপ অসীম ছিল। যাজকেরাই গির্জার নিকটবর্তী মঠে বাস করত। এদের শীর্ষে অবস্থান করতেন পোপ বা ধর্মগুরু। তিনি রোমে থাকতেন। তাঁর নীচে ছিল বিশপ। তাঁরা ছিলেন এক একটি জেলার ধর্মাধ্যক্ষ। বিশপদের নীচে ছিলেন সাধারণ পুরোহিত।

পোপের ক্ষমতা ছিল অসীম। পোপ ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তিকে কর্মচ্যুত করতে পারতেন। কখনও বা তিনি সারা দেশে ধর্মাচার বন্ধ করে দিয়ে লোকের মনে পরলোকে

নরকবাসের আতঙ্ক সৃষ্টি করতেন। এমন কি পোপ ইচ্ছা করলে পশ্চিম ইউরোপের যে কোন দেশের রাজাকে বিধর্মী বলে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারতেন।

সন্ন্যাসী ও নান

যাজকেরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর যাজকেরা লক্ষ্য রাখতেন যাতে খ্রীষ্টান গৃহস্থেরা তাদের নির্দিষ্ট ধর্মাচারগুলো ঠিক ঠিক মত পালন করে চলে। এই শ্রেণীর প্রধান যাজক হলেন বিশপ। আর এক শ্রেণীর যাজকেরা মঠে থেকে জপতপ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। তাদের বলা হত মংক বা সন্ন্যাসী। মঠের অধ্যক্ষকে অ্যাবট বলা হত। অ্যাবটেরা যেসব কঠোর নিয়ম প্রণালী প্রণয়ন করতেন, মঠবাসী সন্ন্যাসীদের সেগুলো পালন করে চলতে হত। অনেক স্ত্রীলোকও সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতেন। তাঁদের বলা হত নান্ বা সন্ন্যাসিনী। নানদের থাকার জন্যে পৃথক মঠের ব্যবস্থা ছিল। যে সব সন্ন্যাসী দেশে দেশে ঘুরে খ্রীষ্টধর্ম ও নীতি প্রচার করতেন তাঁরা ফ্রায়ার (ভাই) নামে পরিচিত ছিলেন। ফ্রায়ারগণ শুধুমাত্র ধর্মপ্রচার করতেন না; দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আক্রান্ত স্থানে গিয়ে দুঃস্থদের সেবা করতেন। এমনকি, যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁরা আহতদের শুশ্রূষা করতে যেতেন। গরীব লোকেরা একমাত্র মঠবাসী



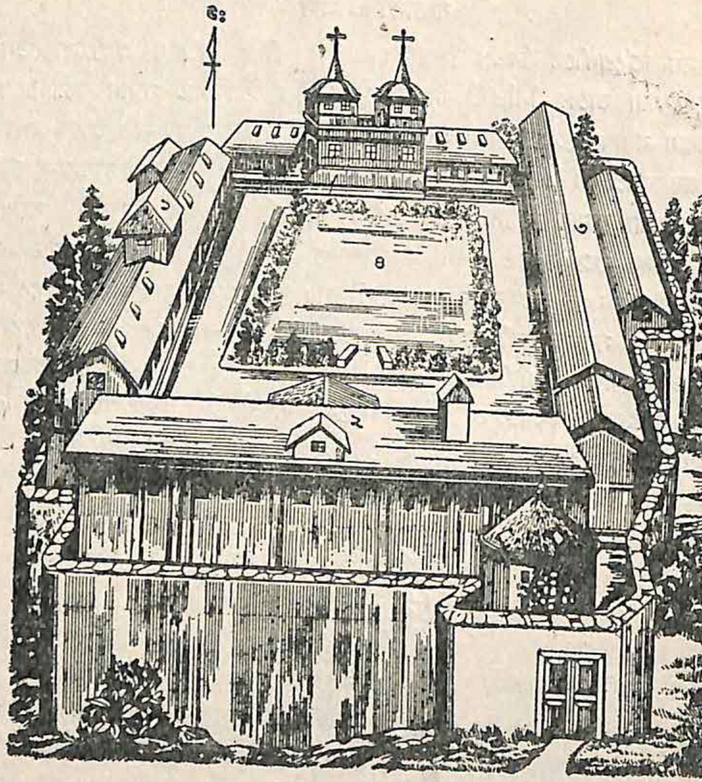
যাজক

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে ভিক্ষা পেত। নিরাশ্রয়, আর্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য যাজকদের মঠের দরজা খোলা থাকত।

মঠের সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা

যে সব সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী মঠে বাস করতেন সারা জীবন ধর্মচর্চাই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। তাই তাঁরা সাধারণতঃ বিয়ে করতেন না। মঠের জীবনে শৃঙ্খলা ছিল।

যাজকেরা উপাসনা করতেন এবং নীরবতা পালন করতেন। মঠের অধিবাসীরা নিজেদের জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেরাই যোগাড় করে নিতেন। কিন্তু



মঠ ঃ (১) ভাঁড়ার ঘর ; (২) খাবার ঘর ; (৩) শোবার ঘর ; (৪) উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।

ক্রমে ক্রমে মঠবাসীরাও ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে সম্পত্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন এবং পরে তাঁরা ঐশ্বর্য্যে, বিলাস ও আরামে দিনযাপন করতে লাগলেন। মধ্যযুগে চার্চের দখলে প্রচুর জমি ছিল ; চার্চই ছিল ইউরোপের সবচেয়ে বড় জমিদার। অথচ যাজকদের সম্পত্তির উপর সম্রাট কর ধার্য করতে পারতেন না। ফলে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাজকেরা ইতস্ততঃ করতেন না। ধীরে ধীরে যাজকেরা পরমার্থ পরিত্যাগ করে ঐহিক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। জনগণের কাছ থেকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অর্থ গ্রহণ করতেন। চার্চের সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে যাজকেরা সামন্ত প্রথা চালু করেছিলেন। চার্চ যেন রাষ্ট্রের ভিতরে আর একটি রাষ্ট্র। এক কথায়, যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা দোষ দেখা দিয়েছিল।

ক্লুনিদের ভূমিকা

কিন্তু মঠের একশ্রেণীর সন্ন্যাসীরা চার্চের ভিতরে এসব দোষ সহ্য করতে পারতেন

না। তাদের ক্লুনি বলা হত। এ জাতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে এবং রাজশক্তির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে চার্চকে মুক্ত করতে ক্লুনিদের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরা প্রধানতঃ বেনেডিক্টের পদ্ধতি মঠে অনুসরণ করে দুর্নীতি, সামন্তপ্রথার প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মঠের ধর্মসম্পর্কীয় আন্দোলনে ক্লুনিদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা সংরক্ষণ ও প্রচারে মঠ ও যাজক শ্রেণীর ভূমিকা

তবে একথা সত্য, যাজকেরাই ছিলেন সমাজের একমাত্র শিক্ষিত শ্রেণী। সে কালে শিক্ষা-দীক্ষার ভারও যাজকদের হাতে থাকত। তাঁরা অনেক সময় ম্যানরের মধ্যে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। মধ্যযুগে মঠগুলো বিদ্যাকেন্দ্ররূপে বিখ্যাত হয়েছিল। সেযুগে বর্বর উপজাতিগুলোর আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য যখন বিধ্বস্ত হয়েছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে অন্ধকার নেমে এসেছিল সে সময় মঠগুলোই আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ইউরোপে শিক্ষা-দীক্ষার কোন অনুশীলন ছিল না বললেই চলে। সে সময় মঠগুলোতেই যাজকেরা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতির চর্চা করে ইউরোপের বুকে জ্ঞানের আলোক শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে এইসব বর্বর জাতিরাই যখন পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেসময় থেকেই কেবলমাত্র মঠের মধ্যে অনুশীলিত জ্ঞান ও বিদ্যার আলোক সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে একে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। ইতালীর টমাস একুইনাস ইংরেজ রোজার বেকন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সন্ন্যাসী ছিলেন।

(গ) রাজশক্তি ও যাজকশক্তির দ্বন্দ্ব

পবিত্র রোমান চার্চের অধীনে খ্রীষ্টান জগৎ ঐক্যবদ্ধ হলে ধর্মগুরু পোপের আধিপত্য ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। মধ্যযুগে পোপের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। যাজক সম্প্রদায় রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করতেন না। বরং রাজা পোপের আনুগত্য স্বীকার করতেন। সিংহাসনে অভিষেক উৎসবের সময় মধ্যযুগে ইউরোপের সম্রাটগণ পোপের হাত থেকে রাজমুকুট ধারণ করতেন এবং পবিত্র রোমান চার্চের নিরাপত্তা ও অগ্রগতির শপথ গ্রহণ করতেন। পোপ শুধু রাজাকে সিংহাসনেই বসাতেন না, যদি রাজা ধর্মীয় কাজে অবহেলা বা অপকর্ম করতেন তবে পোপের তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার ক্ষমতা ছিল। পোপ রাজার মতামতের অপেক্ষা না করে অন্যান্য যাজক নিযুক্ত করতেন।

সামন্তযুগে অভিষেকের পদ্ধতি হল এই যে, রাজা বিশপ প্রমুখ ধর্মযাজক নিয়োগ করে তাদের অভিষেক সংস্কার করতেন এবং ঐ সব যাজক যে যে ভূ-সম্পত্তি ভোগ করতেন তার পরিবর্তে রাজাকে খাজনা দিয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতেন। যখন থেকে যাজক সম্প্রদায় রাজাকে ভূ-সম্পত্তির খাজনা দিয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করতে এবং রাজার দ্বারা অভিষিক্ত হতে অস্বীকার করলেন, তখন থেকেই যাজকশক্তি ও রাজশক্তির মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত। বরং যাজক সম্প্রদায় ঘোষণা করলেন যে পোপের সম্পত্তির উপর কর ধার্য করার ক্ষমতা রাজার নেই।

শার্লেমেনের সঙ্গে পোপ তৃতীয় লিওর সদ্ভাব ছিল এবং অদ্ভূত ক্ষমতা বলে রাজশক্তি ও যাজক শক্তির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করে খ্রীষ্টান জগতে ঐক্যস্থাপন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু শার্লেমেনের মৃত্যুর পর জার্মান সম্রাট ও পোপ উভয়ের মধ্যে কে বড়—এই প্রশ্ন নিয়ে অনেকদিন বিবাদ চলেছিল। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সম্রাট ও পোপের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভের লড়াই চলেছিল। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় হেনরী পর্যন্ত রাজশক্তির উপর পোপের প্রাধান্য ছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালে রাজা পোপকে সাম্রাজ্যের একজন প্রজা হিসেবে গণ্য করতে শুরু করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করবার ক্ষমতা পোপের নেই। পোপের হাত থেকে রাজমুকুট গ্রহণ করা সম্রাটের পক্ষে মর্যাদা হানিকর। বিপরীতপক্ষে মহান্ পোপ সপ্তম গ্রেগরী শর্তাধীনে রাজার কাছ থেকে ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ করাকে পাপ বলে ঘোষণা করলেন। রাজ্যের অর্ধেক সম্পত্তি ও ধনসম্পদ বিশপ ও সন্ন্যাসীদের হাতে ছিল। যাজকগণ অতঃপর রাজশক্তির অধীনতা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করলেন। বিশপ নির্বাচন করার ক্ষমতা রাজার নেই—একথাও তারা দাবী করল। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। অবশ্য ধর্মযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত রাজা চার্চের অধীনতামুক্ত ছিলেন। এসময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাজশক্তি ও যাজকশক্তি আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিবাদের অবসান এবং এক ভাবে ও এক বোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল। কিন্তু ধর্মযুদ্ধের অবসানের পর ইউরোপে ঐ দ্বন্দ্বের আবির্ভাব পুনরায় ঘটে এবং আধুনিক যুগের সংস্কার আন্দোলনের কাল পর্যন্ত ইহা অব্যাহত থাকে।

(ঘ) একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাচর্চা

মঠ ও গির্জায় আশ্রমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়

আগেই বলা হয়েছে, মধ্যযুগে ইউরোপের যাজকসম্প্রদায় ছিল একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁরা মঠে এবং প্রধান গির্জায় (ক্যাথিড্রাল) আশ্রমিক জীবনযাপন করতেন। কয়েকজন শিক্ষক বণিকসঙ্ঘের মত মিলিতভাবে সঙ্ঘ গঠন করতেন। তাঁদের কাছে ছাত্রেরা এসে শিক্ষা লাভ করত। কতিপয় শিক্ষক ও তাঁদের ছাত্র একত্র হয়ে বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করতেন। কখনও বা একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে পড়বার জন্যে বহু ছাত্র সমবেত হত এবং সে প্রকারে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠত। আবার অনেক সময় ছাত্রেরা মিলে বিশ্ববিদ্যালয় খুলত এবং তারা বেতন দিয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করত। এই সকল প্রতিষ্ঠানে সকলদেশ থেকে ছাত্র এবং শিক্ষক এসে যোগদান করতে পারত। এজন্য এগুলোকে বলা হত "বিশ্ববিদ্যালয়"। মূলতঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই পশ্চিম ইউরোপে মঠ ও প্রধান গির্জাগুলিকে কেন্দ্র করেই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেকটি শহরে অন্ততঃ একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেযুগের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হল ইটালীর স্যালার্ণো ও বোলোনা, ফ্রান্সের প্যারিস, ইংলণ্ডের কেমব্রিজ ও অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

মধ্যযুগের ছাত্রজীবনে কষ্ট ও আনন্দ উভয়ই ছিল। শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন পুরোহিত সম্প্রদায়। ছাত্রেরাও প্রধানতঃ যাজক অথবা শিক্ষক হবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়তে আসত। অনেক ছাত্র এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষালাভ করত। এতে ছাত্রেরা দেশ ভ্রমণ করতে করতে তারা ভিক্ষে করে অথবা কোন স্থানে কোন কাজ করে নিজেদের খরচ বহন করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণকালে নাগরিকদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে নিজেদের ভরণপোষণ করত। সচ্ছল অবস্থার ছাত্রদের খরচ বাড়ি থেকে আসত। আবার দেশের ধনী নাগরিকেরাও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করত, আমাদের দেশের নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত।

বিজ্ঞান, সাহিত্য, আইন ও দর্শন পাঠের উদ্ভব

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠের বিষয়বস্তু ছিল তর্কশাস্ত্র, দর্শন, চিকিৎসা, আইন, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়। এখানে পড়ার ক্লাস বসত সকালে। ছাত্রদের বই ছিল না। কেননা সে যুগে ছাপাখানা সৃষ্টি হয়নি। তাই ছাপা বই ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে থাকত মাত্র কয়েকখানা হাতে লেখা পুঁথি। চুরি যাওয়ার ভয়ে সযত্নে সেগুলোকে শিকল-আঁটা আলমারিতে লুকানো থাকত। শিক্ষকেরা পুঁথি নিয়ে ক্লাশে যেতেন এবং জোর গলায় পড়তেন। তারপর চলত আলোচনা। ছাত্রেরা সেগুলো শুনে বিদ্যাভ্যাস করত, অনেক সময় লিখেও নিত। পণ্ডিতেরা বক্তৃতায় ও বই লিখতে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করতেন।

শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্ক

ছাত্রদের থাকবার জন্যে ছিল বাসস্থান, ওদের বলা হত ডরমিটারিজ। সেখানে তারা একসঙ্গে ভোজন ও এক একটা প্রকাণ্ড ঘরে শয়ন করত। একটা গাউন ও একটা টুপি—এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নির্দিষ্ট পোষাক। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। শিক্ষকেরা ছাত্রদের কাছে গিল্ডের ওস্তাদ কারিগরের মত ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে তারা শিক্ষক বা পুরোহিত হত। ছাত্রজীবন শুধুমাত্র লেখাপড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। খেলাধুলা, ব্যায়াম, শিকার করায় তারা যোগদান করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এক এক অঞ্চলের ছাত্রগণ নিজেদের জন্যে এক একটা সমিতিগঠন করত। এরূপ সমিতিগুলোকে 'নেশন' বলা হত। এভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে যৌথ জীবন গড়ে উঠত। তাদের মধ্যে থাকত একতা এবং নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও একটা গর্বের ভাব দেখা যেত।

মধ্যযুগে ইউরোপের জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ

সেকালে এমন অনেক বিদ্বানও ছিলেন যাঁরা এক বিদ্যাকেন্দ্র থেকে অন্য বিদ্যাকেন্দ্রে ভ্রমণ করতেন এবং এরূপে নানাস্থানে শিক্ষাদান এবং ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করে বেড়াতেন।

ইউরোপের মধ্যযুগে প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবেলার্ড, আলবার্টস ম্যাগন্যাস, টমাস একুইনাস, রোজার বেকন।

পিটার আবেলার্ড

পিটার আবেলার্ড ছিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা ও অধ্যাপনা শুনবার জন্যে কেবল ফ্রান্স নয়, ইংলন্ড, জার্মানী, ইটালী এমনকি সুদূর হাঙ্গেরী ও সুইডেন থেকেও অসংখ্য ছাত্র প্যারিসে আসত। গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের মত ছাত্রদের নানা প্রশ্ন জিগ্যেস করে তাদের চিন্তাশক্তি বাড়াবার চেষ্টা করতেন এবং প্রশ্নের সূত্র ধরে দীর্ঘ আলোচনা চালাতেন।

আলবার্টস ম্যাগন্যাস

আলবার্টস ম্যাগন্যাস ছিলেন একজন জার্মান জাতীয় বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি রোজেনবার্গ ও কোলোনে অধ্যাপক ছিলেন। ইনি উদ্ভিদশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, খনিবিদ্যা প্রভৃতি বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। একুশখণ্ডে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। গণিত ও জ্যামিতিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। বিজ্ঞানের ব্যাপারে তিনি খ্রীষ্টানদের ধর্মশাস্ত্র বাইবেলের কথা মানতেন না। সেজন্যে গোঁড়া খ্রীষ্টানরা তাঁকে নাস্তিক বলত।

টমাস একুইনাস

টমাস একুইনাস্ ছিলেন আলবার্টস্ ম্যাগান্যাসের প্রিয় ছাত্র। ধর্মশাস্ত্রে তাঁর মত সুপণ্ডিত তখন আর কেউ ছিল না। তিনি ধর্মশাস্ত্র চর্চায় ও তীর্থযাত্রায় সারাজীবন কাটান। ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজস্র বক্তৃতা দিতেন। তিনি বলতেন, সত্যে পৌঁছিবার দুটি পথ—যুক্তি ও বিশ্বাস। তাঁর রচনা "সর্ববিদ্যা সংগ্রহ" একখানি বিরাট গ্রন্থ। ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ছোটবেলা থেকেই কম কথা বলতেন বলে ছেলেরা তাঁকে ঠাট্টা করে "বোবা ষাঁড়" বলত। কিন্তু তাঁর গুরু আলবার্টস্ ম্যাগন্যাস্ ছেলেদের এই ঠাট্টা শুনে বলেছিলেন—"একদিন এই ষাঁড়ের গর্জন সমস্ত পৃথিবীর লোককে চমকিত করবে।"

রোজার বেকন

রোজার বেকন ছিলেন একজন ইংরেজ সন্ন্যাসী। ধর্মশাস্ত্র ছাড়া বহু বিষয়ে চর্চা করে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। ইনি অকসফোর্ড ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। পুরানো পুঁথি-পড়া বিদ্যেয় পঠন-পাঠনে তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁর মতে, বিজ্ঞানের কথা জানতে হলে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো দেখে ও পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। তিনি মোটা কাঁচের সাহায্যে জাহাজ ও গাড়ি চালাবার কথা বা নীচে স্তম্ভ নির্মাণ না করে সেতু নির্মাণের কথা চিন্তা করতেন। সেকালের লোকেরা তাঁকে শয়তানের চেলা মনে করে চোদ্দ বছর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভাষা ও সাহিত্য

মধ্যযুগে পণ্ডিতদের ভাষা ছিল ল্যাটিন। সকলেই এই ভাষায় বই লিখতেন। সাধারণ লোক এই ভাষা বুঝত না। সেকারণে দেশীয় ভাষায় সুন্দর সাহিত্য সে যুগেই গড়ে উঠে। রাজা আর্থার, রবিন হুড, রোল্যান্ড প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নানা কাহিনীমূলক কবিতা রচিত হয়েছিল। চারণকবিরা এইসব সঙ্গীত গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে রচনা করে গেয়ে বেড়াত।

কথিত আছে, আর্থার বারজন নাইট নিয়ে দেশের শত্রুদের বাধা দিয়েছিলেন। এদের বলা হত "গোল টেবিলের নাইট"। আর্থার স্যাকসনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রথমে জয়লাভ করেন, শেষে হেরে যান। তাঁর মৃত্যুর সময় দেবদূতেরা তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যায়।

রবিন হুড দস্যুবৃত্তি করতেন। তিনি ছিলেন দুষ্টের যম এবং শিষ্টের পালক। স্বজাতিপ্রেমিক রবিন হুড ধনী নর্মানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে অর্থ লুণ্ঠন করতেন এবং সে অর্থ গরীবদের বিলিয়ে দিতেন।

রোলান্ড ও তার সঙ্গিগণ শার্লেমেনকে বাঁচবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। এ কাহিনীকে নিয়ে "রোল্যান্ডের গান" রচিত হয়েছিল। ফ্রান্সে ট্রুবেডারগণ এবং জার্মানীর মিনেসিঙ্গার্সরা দেশে এ গানগুলো গেয়ে বেড়াত।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইটালীর দান্তে ইটালীয় ভাষায় "দি ডিভাইন কমেডি" গ্রন্থ এবং ইংলণ্ডের কবি চসার "ক্যান্টারবেরির কাহিনী" গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচনা করেন। আজও পৃথিবীতে দুখানি কাব্যগ্রন্থ কাব্যরসিকদের সমাদর লাভ করে।

জনপ্রিয় সাহিত্যের পাশাপাশি তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা ইউরোপে চলতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে এ সবের উন্নতি ও প্রসার ঘটে।

শিল্প

মধ্যযুগে শিল্পকলারও বিকাশ হয়েছিল। ইউরোপের নানাস্থানে সুন্দর সুন্দর গির্জা তৈরি হয়েছিল। যে নতুন প্রণালীতে এইগুলো নির্মিত হয়েছিল তাকে গথিক প্রণালী বলে। এই পদ্ধতিতে নির্মিত গির্জা ও বাড়িঘর যেমন সুন্দর, তেমনি সুদৃঢ়। ফ্রান্সের রিম্‌স্‌ নগরের বিখ্যাত ও বিশাল গির্জা গথিক পদ্ধতিতে নির্মিত। এগুলো পরবর্তীকালে ইংলণ্ড ও জার্মানীতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। গথিক গির্জার খিলান কোণাকৃতি। দরজা ও জানালাগুলো বড় বড়। জানালায় রং-বেরং-এর কাঁচ দিয়ে জানালার শোভা বাড়ান হত।

ঘটনাপঞ্জী ঃ

৭৬৮ খ্রীঃ অঃ শার্লেমেনের সিংহাসন লাভ
৮০০ ,, ,, শার্লেমেনের অভিষেক (নতুন রোমান সাম্রাজ্য)
৮১৪ ,, ,, শার্লেমেনের মৃত্যু

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শার্লেমেন কত সালে সিংহাসন লাভ করেন?

২। শার্লেমেনের রাজধানী কোথায় ছিল? ৩। তাঁর সভাপণ্ডিত কে ছিলেন?

৪। কার লেখা গ্রন্থ থেকে শার্লেমেনের জীবন-কথা জানা যায়?

৫। স্পেনের যুদ্ধে কোন্ বীর অসীম বীরত্ব দখান?

৬। শার্লেমেন কথাটির অর্থ কি? ৭। খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরুকে কি বলে?

৮। মঠের অধ্যক্ষকে কি বলা হয়?

৯। মধ্যযুগে ইউরোপে সবচেয়ে বড় জমিদার কে?

১০। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কি কি?

১১। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের গঠিত সমিতিকে কি বলা হত?

১২। টমাস একুইনাসের বিখ্যাত গ্রন্থ কি?

১৩। যারা গ্রামে ও সহরে গান রচনা করে গেয়ে বেড়াত তাদের কি বলা হত?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ফ্রাঙ্ক রাজ্য বলতে কোন্ দেশ বুঝায়?

২। শার্লেমেনের চেহারার বর্ণনা দাও।

৩। শার্লেমেন কিরূপে "রোমান সম্রাট" হয়েছিলেন?

৪। ইউরোপের কোন্ কোন্ রাজ্য শার্লেমেনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

৫। মধ্যযুগে যাজকদের শ্রেণী বিভাগ কিরূপ ছিল?

৬। ফ্রায়ার কাদের বলা হয়?

৭। ছাত্রদের আবাসিক জীবনে কিভাবে ভরণ-পোষণ চলত?

৮। মঠের ধর্ম-আন্দোলনে ক্লুনিদের ভূমিকা কিরূপ ছিল?

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কি কি বিষয়ে পড়ান হত?

১০। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় বই-য়ের ব্যবস্থা কেমন ছিল?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। শার্লেমেনের অভিষেক কে করেছিলেন? তাঁর অভিষেকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শার্লেমেনের মহত্ত্ব আলোচনা কর।

৩। মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে শার্লেমেনের অবদান কি?

৪। মধ্যযুগে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কি জান?

৫। মধ্যযুগের পুরোহিতদের আশ্রমিক জীবন কিরূপ ছিল?

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। রাজশক্তির সঙ্গে যাজকশক্তির দ্বন্দ্বের কারণ কি?

৮। মধ্যযুগের বিখ্যাত দুজন বিদ্বান এবং দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় লিখ।

৯। মধ্যযুগে মঠগুলো শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল কেন?

১০। মধ্যযুগের সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে কি জান?

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্তপ্রথা

(ক) সামন্ত প্রথার উদ্ভব

অষ্টম শতকে পশ্চিম ইউরোপের সমাজ জীবন বর্বর ছিল না। পূর্ব ইউরোপে তখন বর্বর যুগ চলছিল, সভ্য সমাজ জীবন সেখানে ছিল না। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে এক ভগ্ন সভ্যতা ছিল যেখানে আইন ছিল না, শাসনব্যবস্থা ছিল না, রাস্তাঘাট ছিল ভগ্ন, শিক্ষাক্ষেত্রে ছিল বিশৃঙ্খলা। সময়টা তখন ছিল অরাজকতা, লুণ্ঠন, যুদ্ধ-হাঙ্গামার যুগ। দেশে অপরাধের শাস্তি ছিল না, সর্বত্র নিরাপত্তার অভাব ছিল। তাছাড়া, দস্যু-তস্করের উপদ্রব, বর্বর জাতিদের আক্রমণ অথবা রাজায় রাজায় প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। পশ্চিম ইউরোপের কোন দেশেই সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার ছিল না। দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণ জীবন ও ধনসম্পত্তির জন্যে সব সময়ই নিজেদের বিপন্ন মনে করত। কোন একক মানুষ নিরাপদ ছিল না। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ সমাজের সবল শ্রেণীর আশ্রয় না চেয়ে পারত না। তখন তারা শক্তিশালী রাজা বা বড় বড় জমিদারদের আশ্রয়প্রার্থী হল। কোন ক্ষমতাশালী বিশপ দীর্ঘদিনের স্বীকৃত জমিদার, প্রাচীন পরিবারের কর্তা, উদ্ধত ক্ষমতাশালী নেতা, রোমান সরকারের পদমর্যাদাশালী রাজকর্মচারী দরিদ্র জনসাধারণকে আশ্রয় দিলেন। নিঃসঙ্গ অসহায় মানুষ আত্মরক্ষা ও সতর্কতার জন্যে কোন প্রতিরোধ সমাজ বা সমিতির আশ্রয় না নিয়ে বরং জেলার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও কর্মী পুরুষকে বেছে নিল। দরিদ্র কৃষকেরা বিত্তবান জমিদারের দারস্থ হল। সুতরাং মানুষ নিজেকে অপরের সঙ্গে বিশেষত শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে বাধ্য হল। আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে চুক্তির সাপেক্ষে এই স্বাভাবিক মিত্রতা ও সংযোগের ফলে পশ্চিম ইউরোপে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হল, তাই ইতিহাসে "সামন্ত প্রথা" নামে অভিহিত হল।

রাশিয়ার পশ্চিম দিকে প্রত্যেকটি ইউরোপীয় সমাজে অষ্টম শতাব্দীতে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। মহান্ চার্লসের পরবর্তীকালে এই প্রথা ইউরোপে প্রচলিত হলেও সম্রাট ক্লোভিসের সময়ে এই প্রথার বীজ রোপিত হয় এবং সম্রাট পিপিন ও চার্লসের সময় থেকে এই প্রথা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এক এক রাজা ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। ফলে বিচিত্ররূপে এই প্রথার বিকাশ ইউরোপে দেখা যায়।

সামন্ত প্রথা

ফিউডাল বা সামন্ত প্রথা হল রাজার সঙ্গে মুখ্য জমিদারের এবং মুখ্য জমিদারের সঙ্গে মধ্য জমিদারের একটা বন্দোবস্ত। এই প্রথার মূল কথা হল, সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে জমিদারী ভোগ করা। জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক হল প্রথম জন পিতৃসুলভ নিরাপত্তা দেবে, পরিবর্তে শেষোক্তজন সামরিক সাহায্য দেবে ও আনুগত্য জানাবে। সেকালে বড় বড়

জমিদারগণ তাদের জমিদারীগুলো পেত রাজার কাছ থেকে। এর বিনিময়ে তারা রাজাকে নগদ টাকা না দিয়ে যুদ্ধের সময় সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করত। বড় জমিদারেরা আবার এরূপ শর্তে তাদের ভূমি সম্পত্তি মধ্য-জমিদারদের মধ্যে ভাগ করে দিত। সবশেষে যাদের ভাগ করে দিত তাদের বলা হত "সার্ফ।" এরা ঠিক ক্রীতদাস নয়, আবার



মধ্যযুগের দুর্গ

সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন কৃষকও নয়। এরা নিচের স্তরের জমিদারদের জমিতে কাজ করত। চাষের সময় ছাড়া, সামন্ত প্রভুর বাড়ীতে বিনা মজুরিতে অন্য কাজ করে দিত। জমিদারদের যুদ্ধের সময় সৈন্য-সামন্তের প্রয়োজন হলে তারা রাজার পক্ষে যুদ্ধ করত। যুদ্ধের সময় সার্ফরা রাজার হয়ে যুদ্ধ করত অথচ রাজার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না। মাঝখানের সামন্ত প্রভুদের নিজেদের ভরণ পোষণের জন্যে কোন কাজ করতে হত না। শুধু মাত্র যুদ্ধের সময় রাজাকে সাহায্য করতেন, আশ্রিত প্রজাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতেন এবং নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন।

সুতরাং রাজা ও সামন্তের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল জমি। জমির বিনিময়ে জমিদার রাজার অথবা কৃষক জমিদারের সামন্ত হবে। সে প্রভুর কাছে নতজানু হয়ে প্রভুর হাতের মধ্যে হাত রেখে সেবা ও প্রভুভক্তির শপথ গ্রহণ করত। তাছাড়া, প্রভুকে অর্থ বা শস্য দিয়ে রাজস্ব দিত, প্রভুর হয়ে কর আদায় করতে অথবা প্রভুর কল চালাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হত। এই বিশ্বস্ত শপথের বিনিময়ে সামন্ত বা কৃষক জমিদারির উপর স্বত্ব লাভ করত।

সামন্তেরা বা কৃষকেরা বংশানুক্রমে জমি ভোগ করত যতদিন তারা তাদের শর্তগুলো পালন করত। আবার তারা অধস্তনদের মধ্যেও জমি বণ্টন করে দিত একই শর্তে। সুতরাং উভয় পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হত। তবে চুক্তির শর্ত কোন নির্দিষ্ট ছিল না; প্রচলিত স্থানীয় প্রথার ভিত্তিতেই সামন্ত-চুক্তি নিষ্পন্ন হত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সামন্তের সেবা বিচিত্র ছিল। মোটামুটিভাবে সামন্তের কর্তব্য হল, মনিবের স্বার্থ রক্ষা, মনিবের খবর গোপন রাখা, শত্রুর পরিকল্পনাকে প্রতারিত করা, প্রভুর পরিবারকে রক্ষা করা, আহ্বান-মাত্রই সামরিক সাহায্য করা, মনিবের দুর্গ পাহারা দেওয়া ইত্যাদি। কোন কোন সামন্ত প্রভু আবার সার্ফদের কাছ থেকে চুক্তির শর্তগুলো লিখিয়ে নিত।

সামন্ত প্রথা যাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল পদমর্যাদা অনুসারে তাদের সাজালে ঠিক পিরামিডের আকার ধারণ করবে। সব নীচে ছিল নাইট এবং সর্বোচ্চে ছিল রাজা—যিনি সবচেয়ে বেশী জমির মালিক এবং যিনি নিজের রাজ্যকে ভগবানের দান বলে মনে করেন। অতএব সামন্তপ্রথা হল রাজা, মুখ্য জমিদার, মধ্য জমিদার সার্ফগণের মধ্যে প্রবর্তিত এক সামাজিক এবং পরোক্ষে রাজনৈতিক বা আইনগত বন্দোবস্ত।

পুরোহিতদের সামন্তশাসন

সামন্তপ্রথার প্রভাব চার্চের উপর পড়েছিল। ইউরোপে মধ্যযুগে চার্চ ছিল সবচেয়ে বড় জমিদার। চার্চের ছিল প্রচুর জমি। সম্রাট অটোর আমলে রাজ্যের অর্ধেক সম্পত্তি চার্চের অধীনে ছিল। সম্রাট অটো চার্চ ও পুরোহিত শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি মহান চার্লসের মত বাড়িয়ে দিলেন। রাজ্যের সমস্ত ধর্মনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ফলে রাজসভায় এবং শাসনব্যবস্থায় পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়ে দিলেন। ফলে বিশপ ও মঠাধ্যক্ষদের ক্ষমতা সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে বেড়ে গেল। চার্চের সম্পত্তি বেশী অথচ তাদের সামরিক শক্তি বিন্দুমাত্র ছিল না। বরং তাদের মধ্যে এই মতবাদ গড়ে উঠতে লাগল যে রাজা চার্চের সম্পত্তির উপর কোন কর আদায় করতে পারেন না। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য কমাবার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন। তবে জার্মানীতে যতখানি বেড়েছিল, অন্য কোথাও ততখানি বাড়েনি। ইংলণ্ডের উইলিয়াম সামন্ততন্ত্রের সংস্কার সাধনের ফলে চার্চের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করলেন। কিন্তু কোথাও যাজক সম্প্রদায়ের উপর রাজকীয় প্রাধান্য স্থাপিত হয়নি। ফলে পোপের ক্ষমতা অপরিসীম ছিল। পুরোহিতগণ নিজেদের সম্পত্তি বিলিবণ্টন করে কৃষকদের উপর ধর্মের নামে কর ($\frac{১}{১০}$ অংশ) ধার্য করে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে পড়লেন। চার্চের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হল। যাজকদের স্বতন্ত্র বিচারালয়ে বিচার পাওয়ার অধিকার ছিল। এই সকল বিচারালয়ে ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী পুরোহিতমণ্ডলী বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তাদের শাসনব্যবস্থা রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। সমগ্র রাষ্ট্রের মধ্যে চার্চ ছিল এক একটি খুদে রাষ্ট্র।

সামন্ততান্ত্রিক শাসন

রাজনৈতিক দিক দিয়ে সামন্ত প্রথার প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই প্রথা অনুসারে বড় বা

ছোট যে কোন জমির মালিক তার জমিদারীতে বসবাসকারী প্রজাদের শাসনকর্তা হতে পারতেন। সকল সামন্ত রাজা ও জমিদারেরা সামন্ততন্ত্রকে কেন্দ্র করেই আইন, বিচার ও কর-ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন তৈরী করতেন। প্রত্যেক জমিদার তাঁর অধীনস্থ প্রজার কাছ থেকে যেমন মর্যাদা ও আনুগত্য লাভ করতেন তিনিও তেমনি তার প্রভুকে (রাজাকে) আনুগত্য ও মর্যাদা দেখাতেন। ফলে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত নিজস্ব আইন সরকারী আইন-কানুনের স্থান অধিকার করেছিল। সত্যি কথা বলতে কি প্রচলিত সরকারী আইন-কানুন সামন্তযুগে ব্যর্থ হয়ে দেশ থেকে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সামন্ত প্রভুদের তৈরী আইন ও বিধি ব্যবস্থা সেই শূন্যস্থান দখল করল। রাজকর্তব্য বা সরকারী কর্তব্য ব্যক্তিগত নৈতিক দায়িত্বে পরিণত হল। সামন্ততন্ত্রের এই নীতি ও পদ্ধতি এমন একরূপী ও বাপক হল, শাসক শ্রেণী তাদের এমনভাবে সমর্থন করতে বাধ্য হল যে সমগ্র ইউরোপীয় সমাজে সামন্ততন্ত্র কঠিন ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হল এবং এই প্রথাকে ইউরোপ থেকে সরাতে বিশ পুরুষ ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

জমিদারের দুর্গবাড়ী ও এর গুরুত্ব

জমিদারের এলাকাকে বলা হত ম্যানর। এই ম্যানরে জমিদার বাস করতেন। কোন কোন দুর্গবাড়ী দুর্গাকারে নির্মিত হত। এরূপ বাড়ী করার প্রয়োজন ছিল। ফ্রাঙ্কো সাম্রাজ্যে তেমন সুরক্ষিত স্থান ছিল না। রোমান আমলে প্রাচীর দিয়ে নগরগুলোকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করা হত, কিন্তু তাতেও নগরগুলো শত্রুর আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। ফ্রাঙ্ক জাতির মাটির উঁচু ঢিপি করা, চারদিকে পরিখা খনন করা এবং এর সাময়িক নিরাপদ স্থান ছিল অপ্রচুর এবং ডেনদের আক্রমণ থেকে একমাত্র সুরক্ষিত স্থান হল দৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ। যে শহরগুলো তখনো ধ্বংস হয়নি সেগুলোর চারদিকে বৃত্তাকার প্রাচীর ছিল। কিন্তু সব চেয়ে নিরাপদ স্থান ছিল দুর্গবাড়ীগুলো। জমিদারেরা আগে জমিদারীর খোলা জায়গায় অট্টালিকা নির্মাণ করত। পরে নিরাপত্তার জন্যে জমিদারেরা দুর্গবাড়ী নির্মাণ করতে শুরু করে। প্রথম দিকে দুর্গের সংখ্যা ছিল নগণ্য পরে ধীরে ধীরে সমগ্র ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের প্রত্যেক জমিদারীতে দুর্গবাড়ী নির্মিত হয়।

মধ্যযুগে এই সামন্তদের দুর্গের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এই দুর্গগুলোর অবস্থান যুদ্ধের গতি পালটে দিত। যখন বর্বর শত্রুরা লুট-তরাজের জন্যে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করত, তখন কৃষকেরা ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা ঐসব দুর্গগুলোতে আশ্রয় নিত। ফলে পূর্বে আক্রমণকারীরা যত সহজেই জেলাগুলোর উপর লুট চালাত, এখন শত্রুদের দুর্গ ভেঙে লুট করার জন্যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে থাকতে হত। লুটেরাদের দুর্গ ভাঙার কোন নিশ্চিত পদ্ধতি জানা ছিল না। দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের দুর্গের সামনে অপেক্ষা করতে হত। লুটের মাল হত অল্প, অন্যদিকে দেশের সমস্ত সামরিক শক্তি তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ পেত। অথচ এটা তাদের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক আক্রমণকারীদের নিজেদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিত। সুতরাং জমিদারদের

দুর্গগুলো নবম শতাব্দীতে খ্রীষ্ট ধর্মের শাসনাধীন দেশগুলোর উপর ডেন, স্যারাসেন, ম্যাগিয়ার প্রভৃতি জাতিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার সবচেয়ে বড় প্রতিকার ছিল।

সাঁজোয়া অশ্বারোহী ও এদের উপযোগিতা

মধ্যযুগে দ্রুতগামী বর্মপরিহিত সাঁজোয়া অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। এরাও খ্রীষ্টান জগৎকে সামন্তযুগের শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করত। সামন্ত প্রথার অনেক দোষ-ত্রুটি ছিল, একথা ঠিক। কিন্তু এই দ্রুতগামী সাঁজোয়া অশ্বারোহীরা দেশের সামরিক দক্ষতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলে শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ ও লুঠতরাজের মোকাবিলা এরা করতে পারত। যুদ্ধ করা অপেক্ষা লুটতরাজ করাই এদের আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ফ্রাংক সাম্রাজ্যের ধীরগামী পদাতিক বাহিনী এই সমস্যার মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিল। ডেন, স্যারাসেন ও ম্যাগিয়ারদের হালকা অশ্বারোহীরা খুব সহজেই লুট করে সরে পড়ত। স্থানীয় কাউণ্ট বা ডিউকদের কয়েক শ' করে সাঁজোয়া অশ্বারোহী থাকত। এরা মনিবের খুব বিশ্বাসী ও অনুগত ছিল। এরা লুণ্ঠনকারী দস্যুদের পক্ষে বিপজ্জনক শত্রু ছিল। তাদের গতি দ্রুত থাকায় শত্রুকে সহজে কায়দা করে ফেলতে পারত। যখন অল্প-সংখ্যক অশ্বারোহী-বাহিনী শত্রুকে প্রতিহত করতে না পারত, তখন লুটেরাদের দল থেকে এরা বিচ্ছিন্ন করে দিত, চারদিকে ঘিরে ধরত, অথবা সরু পথের মাঝে বাধা দিত অথবা রাস্তায় মোড় মাথা যেগুলো সাঁজোয়া অশ্বারোহীরা ভালো করে জানত ডেন, ম্যাগিয়ার প্রভৃতি শত্রুদের সেখানে টেনে এনে ধোঁকা দিত। ফলে দ্রুতগতিসম্পন্ন লুট-তরাজকারী দস্যুদের আক্রমণ মোকাবিলা করার যে সমস্যা মধ্যযুগে ছিল, তা অনেকটা এদের দ্বারা সম্পন্ন হত।

নাইট ও বীরধর্ম

সামন্ত যুগে জমিদার বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা লেখাপড়া শিখত না। তার চেয়ে যুদ্ধকার্যকে অধিকতর সম্মানজনক বলে মনে করত। এই সম্প্রদায়ের তরুণেরা প্রথমতঃ কোন বিখ্যাত যোদ্ধার অনুচর হয়ে তার ঢাল বহন করত। সেই সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারও শিক্ষা করত। তাদের বলা হত "স্কোয়ার"। যুদ্ধবিদ্যা ভালরূপে শিখে স্কোয়ারগণ নিজেদের জমিদারবাড়ীতে ফিরে আসত। তখন তারা কোন রাজা বা কোনও বড় জমিদারকে প্রভু স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে "নাইট" পদবী গ্রহণ করত। যেদিন যে যুবককে নাইট করা হবে তার পূর্ব দিনে সে তার তরবারিখানা গির্জায় নিয়ে গিয়ে পুরোহিতকে দিত। পুরোহিত সেই তরবারিখানা আশীর্বাদ করে রাখতেন। ভাবী নাইটও গির্জায় সমস্ত রাত জেগে থাকত এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। পরদিন ঐ যুবক পুরোহিতের সামনে নাইটের শপথ গ্রহণ করত। খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাস রেখে, সত্যকথা বলব এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব না, প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী থাকব এবং আমার অস্ত্রবল ও শারীরিক বল দুর্বলদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের রক্ষায় সর্বাগ্রে প্রযুক্ত হবে—এইরূপ ছিল শপথ। ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করবার পর পুরোহিত যুবকের কোমরে

তরবারিসহ কোমরবন্ধ পরিয়ে তার কাঁধে মৃদু চাপড় মারতেন এবং বলতেন—"সাহসী নাইট হও।" তখন যুবক নাইটের পদবী ও মর্যাদা লাভ করত। কখনও কখনও রাজা অথবা অন্য কোন প্রবীণ নাইট উপযুক্ত যুবককে নাইট করে দিতেন এবং হাতের চাপড়ের পরিবর্তে তরবারির পিছন দিক দিয়ে যুবকের কাঁধে ছুঁইয়ে দিয়ে বলতেন—"তুমি নাইট হলে"। যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন কোন সাহসী যুদ্ধপটু যুবককে নাইট করা হত। তবে বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রেই কোন খ্রীষ্টান পর্ব যেমন বড় দিন উপলক্ষ্যে উহা করা হত।



মধ্যযুগের নাইট

সেই বর্বর যুগে নাইটদের মধ্যেই সর্ব প্রথমে সভ্য সমাজের আদর্শ গড়ে ওঠে। নাইটেরা যে যে কর্তব্য পালন অথবা যেরূপ আচরণ করতে বাধ্য থাকত তাকে এক কথায় বীরধর্ম (শিভ্যালরী) বলা হত। ভয় না-পাওয়া, বিপদ ও মরার ভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করা, নিয়ম মেনে চলা, রাজা বা জমিদারদের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত না হওয়া, নারীর মর্যাদা রক্ষা করা, সম্মানীয় ব্যক্তিদের মেনে চলা এবং মার্জিত ও ভদ্র ব্যবহার করা—এইগুলো ছিল বীরধর্মের অন্তর্গত। কোন নাইটের চরিত্রে বীরধর্মের অভাব দেখলে সকলেই তাকে নিন্দে করত।

নাইটেরা সব সময় বর্ম ধারণ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থকত। যে মুহূর্তে কর্তব্যের

আহ্বান আসবে অমনি যুদ্ধের জন্যে যাতে ধাবিত হতে পারে, সেজন্যে প্রস্তুত থাকত। নাইটেরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। তাদের অস্ত্র ছিল তরবারি, বর্শা ও ঢাল। তারা লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত। যুদ্ধজয়, রাজার অভিষেক কিংবা রাজপরিবারের কোন বিয়ে উপলক্ষে নাইটেরা যে বিখ্যাত খেলায় অংশগ্রহণ করত তার নাম টুর্নামেণ্ট।



নাইট উপাধিদানের অনুষ্ঠান

নাইটের আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল টনটনে। কথায় কথায় তাদের ঝগড়া বেধে যেত এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে সেই ঝগড়ার সীমাংসা হত। নাইট পদবীটা বংশানুক্রমিক চলত না। জমিদার বাড়ীর বীর যুবককে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে উহা অর্জন করতে হত।

ভাট (চারণ)

আমাদের দেশের ভাট বা চারণদের (ট্রুবেডার) মত মধ্যযুগে ইউরোপেও এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা ম্যানরে ম্যানরে ঘুরে গান ও ছড়া গেয়ে বেড়াত। ম্যানরবাসীরা তাদের মুখে বাইরের নানা খবর শুনতে পেত, যদিও অধিকাংশ খবরই থাকত আজগুবি। তারা সেযুগে বীরদের জীবনী নিয়ে ছড়া রচনা করত। মেলায়, পথে, অথবা সামন্ত প্রভুদের ভোজনকক্ষে তারা গান গেয়ে বেড়াত।

(খ) ম্যানর প্রথা

সামন্ত যুগে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত। এই গ্রামগুলোকে বলা হত ম্যানর। ম্যানরই ছিল সমাজের ভিত্তি। ম্যানর বা গ্রামের জীবনযাত্রায় সামন্তপ্রভু বা জমিদারের প্রাধান্য ছিল। প্রত্যেক গ্রামে বাস করত একজন জমিদার ও তার প্রজাগণ। দেশের যেসব

অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা কম, সেসব অঞ্চলের ম্যানরে জমিদার বাড়ী কাঠের তৈরী হত। বাড়ীর চারদিকে পরিখা বা পাঁচিল থাকত না। ঘরের দেওয়াল জুড়ে কারুকার্যময় পর্দা অথবা অস্ত্রশস্ত্র বা শিকারের চিহ্ন ঝুলান থাকত। জমিদারের ম্যানর বাড়ীতে হলঘরে খাওয়া-দাওয়া চলত। হলঘরের মেঝেতে থাকত প্রকাণ্ড টেবিল। জমিদারবাড়ীতে যখন ভোজ দেওয়া হত, তখন গোটা শূকর বা ষাঁড় সেদ্ধ করে টেবিলের উপর রাখা হত। জমিদার পরিবারের সকলে, নিমন্ত্রিত অতিথিরা ছুরি, কাঁটা দিয়ে ঐ সেদ্ধ জন্তুগুলোর দেহ থেকে মাংস কেটে ভক্ষণ করত এবং কুকুরের জন্যে হাড়গুলো মেঝেতে ফেলে দিত। জমিদার বাড়ীতে আমোদ-প্রমোদের অভাব ছিল না। ভোজনের সময় চলত গান, ছড়া আবৃত্তি ও নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুক। এজন্যে জমিদারেরা তাদের ম্যানরগুলোতে চারণ ও বাজীকর পুষে রাখত। এই শ্রেণীর জমিদার বাড়ীতে অনেকগুলো শয়নকক্ষ ও ভোজনের জন্যে প্রকাণ্ড হলঘর থাকত। তাছাড়া, চাকরদের থাকবার ঘর, ভাণ্ডার, উপাসনাগার, ঘোড়ার আস্তাবল প্রভৃতি তো থাকতই।

জমিদারের বাড়ীর কাছে থাকত জনসাধারণের বস্তী। জনসাধারণের মধ্যে চাষীদের সংখ্যাই বেশী। গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাইরের জগতের সঙ্গে এদের বিশেষ সম্পর্ক থাকত না। গ্রামবাসীদের ব্যবহারের জন্যে যেসব জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হত তা গ্রামেই তৈরী হত। এজন্যে গ্রামে চাষী ছাড়া কামার, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কারিগর গ্রামে বাস করত। ফলে প্রত্যেকটি গ্রামে একটা করে পৃথক সমাজ গড়ে উঠেছিল। কোন গ্রামকে অন্য গ্রামের উপর নির্ভর করতে হত না। এগার শতক পর্যন্ত মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুদের প্রাসাদ, দুর্গ এবং চাষীদের গ্রাম্য জীবন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

সামন্ত-প্রথার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

সামন্ত প্রথায় দেখা যায়, জমিদার ও প্রজাসাধারণ একত্রে ম্যানরে যে বাস করত এর একটা অর্থনৈতিক দিক ছিল। ফ্রাঙ্কজাতি যখন গলদেশ জয় করেছিল, তখনই তারা এই-রূপ একটা প্রথা গলদেশে নিয়ে এসেছিল। ফ্রাঙ্কজাতি যখন গলদেশে আক্রমণ চালাত তখন তারা একজন নেতা অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকগোষ্ঠীর অধীনে আক্রমণ করত। যুদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধের পরেও রাজার সাঙ্গপাঙ্গ, অনুচর, কাউণ্ট বা অধিনায়কগণ রাজার কাছেই জমায়েত হত। এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। রাজার সঙ্গে কাউণ্টের যেমন সম্পর্ক, দুর্বল প্রভুর সঙ্গে শক্তিশালী সামন্ত প্রভুর তেমনই সম্পর্ক, বিজয়ী নেতা বা রাজা যুদ্ধের পর অধিকৃত বা দখলীকৃত সম্পত্তি তার অনুচর ও সাঙ্গপাঙ্গ-দের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। কিন্তু সেসব সম্পত্তিকে রক্ষার প্রশ্ন ছিল। তাই রাজা ও কাউণ্ট বা অনুচরগণ দখল করা সম্পত্তি ও লোকজনের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। তাদের মধ্যে তখন দলবদ্ধভাবে থাকার ধারণা গড়ে ওঠে। সেটাই ধীরে ধীরে সামন্ত প্রথায় রূপ নেয়। সুতরাং রাজা ও জমিদার, জমিদার ও প্রজাসাধারণ—উভয়েই অর্থনৈতিক তাগিদে সামন্ত প্রথার উদ্ভব করেন।

গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থা

সামন্ত যুগে ম্যানর বা গ্রামগুলো ছিল সামন্ততান্ত্রিক সরকারের ক্ষুদ্র সংস্করণ। জমিদারেরা তার এলাকায় গভর্ণরের মত ছিল। প্রত্যেক জমিদারের কর্তব্য ছিল প্রজাদের সকল অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং নিজ নিজ এলাকা শাসন করা এবং সেখানে শান্তি-রক্ষা করা। তাই জমিদারেরা নিজেরাই আইন রচনা করত। রাজাও জমিদারদের এলাকায় শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না, অথবা অন্য কোন স্বাধীন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে নিবৃত্ত করতেন না। ফলে জমিদার ছিলেন তাঁর এলাকায় সর্বময় কর্তা। তিনি খাস জমি বিলি করতেন, ইচ্ছেমত শান্তি বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন। প্রজাদের উপর কর ধার্য করতেন। ম্যানরগুলো ছিল মধ্যযুগের ইউরোপের ক্ষুদ্র স্থানীয় সরকার। প্রত্যেক গ্রামে একটা করে বিচারালয় থাকত। জমিদারেরা গ্রামের সকল বিচার নিজের মহালের বিচারালয়েই করতেন এবং অপরাধের যথেচ্ছ দণ্ডদানও করতেন। শাসনসংক্রান্ত আইন ও বিচার-বিভাগীয় আইন জমিদারেরাই প্রণয়ন করতেন।

কৃষকদের অবস্থা

ভিল্যান

মধ্যযুগে ইউরোপের সকল দেশেই কৃষকদের সংখ্যা অন্য সকল শ্রেণীর লোক অপেক্ষা বেশী ছিল। এরা ম্যানরে জমিদারের প্রাসাদ বা দুর্গবাড়ীর আশেপাশে বাস করত। কৃষকেরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণীর চাষীকে বলা হত স্বাধীন চাষী (ভিল্যান)। এরা জমিদারের জমি চাষ করে দিত এবং নিজেদের জন্যে যে পৃথক ভূমিখণ্ড থাকত তাতে শস্য চাষ করে নিজেরাই ভোগ করতে পারত। জমিদারের জমিতে চাষ করে দেওয়া বাদে নিজেদের জমির কিছু ফসলও তারা জমিদারকে দিত। তারা মাঠ থেকে শস্য, শাকসব্জি, আশেপাশের জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি এনে জমিদারের বাড়ী পৌঁছে দিত। জমিদারের নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে গেলে এই শ্রেণীর কৃষকেরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত। এমন কি এরা ইচ্ছে করলে এক জমিদারের জমি ছেড়ে দিয়ে অন্য জমিদারের আশ্রয়ে চলে যেতে পারত।

সার্ফ

দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষকদের বলা হত ভূমিদাস (সার্ফ)। তাদের প্রায় সর্বদাই জমিদারের খাস জমিতে চাষ করে দিতে হত। বেশীরভাগ প্রজা ছিল ভূমিদাস। এদের নিজস্ব কিছু কিছু জমি থাকত। এরা প্রথম শ্রেণীর কৃষকের মতই জমি চাষ করত এবং প্রভুকে শস্যের খাজনা দিত। কিন্তু প্রভুর বিনা অনুমতিতে জমি ছেড়ে কোথাও যেতে পারত না। এমনকি মনিব অনুমতি দিলে তবে তারা বিয়ে করতে পারত। তাদের বাধ্যতামূলকভাবে জমিদারের জমিতে কিংবা বাড়ীতে বেগার দিতে হত। এতে তাদের দিনের অর্ধেক সময় কেটে যেত। জঙ্গলে শিকার করা কিংবা কাঠ কুড়ানো বা নদী ও পুকুর থেকে মাছ ধরবার স্বাধীনতা এদের ছিল না। প্রভুর কাছারিতেই তাদের বিচার হত। সুতরাং তাদের জীবন ছিল প্রায়

ক্রীতদাসের মত; তবে হাটে-বাজারে গরু-ঘোড়ার মত তাদের বেচা-কেনা চলত না। ভূমিদাসেরা যে ভূমির সঙ্গে জড়িয়ে থাকত, সে ভূমি বিক্রী হয়ে গেলে তারাও নতুন ক্রেতার অধীনে চলে যেত। তারা যেন প্রভুর দখলীকৃত্ব সম্পত্তি। সুতরাং ভূমিদাস-প্রথা বংশানুক্রমিক ছিল।

কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা

যৌথচাষ ঃ প্রত্যেক কৃষকের নির্দিষ্ট জমি থাকলেও গ্রামের সমস্ত জমি একযোগে (যৌথভাবে) চাষ করা হত। চাষের কোন উন্নত প্রণালী তারা জানত না। বিরাট মাঠ জুড়ে প্রভু ও কৃষকদের টুকরো টুকরো জমি ছিল। কিন্তু কোন জমিতে সীমানা বা বেড়া দেওয়া ছিল না। সাধারণভাবে লাঙ্গল দিয়েই তারা চাষ করত। জমিদারের ফসল তার গোলাজাত করে দিয়ে নিজেদের জন্যে অবশিষ্ট যা থাকত তার পরিমাণ বেশ অল্প।

সম্পত্তি ঃ কৃষকদের যৎসামান্য সম্পত্তি ছিল। জমিদারের দেওয়া জমি ছাড়া গৃহপালিত পশুর মধ্যে কয়েকটা শূকর ও বলদ এবং একটা দুধালো গাভী থাকত। অবস্থাপন্ন চাষীদের দু'একটা ঘোড়া থাকত।

খাদ্য ঃ সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল গমের রুটি ও শাকসব্জি। তখন মাংস ছিল দুর্মূল্য। তাই তাদের ভাগ্যে বড় একটা মাংস জুটত না। যেটুকু জুটত, তার খানিকটা আবার নুন মেখে শীতকালে খাবার জন্যে রেখে দিত। পচাই মদও তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল।

পোশাক ঃ তারা চামড়া, শণ বা পশমের পোশাক ব্যবহার করত। এই সাদাসিধা পোশাকের বেশী তাদের ভাগ্যে জুটত না। মেয়েরা বাড়ীতে সুতা কাটত এবং তাঁতে কাপড় বুনত।

বাসগৃহ ঃ কৃষকেরা ম্যানরের মধ্যে ছোট ছোট কুটীরে বাস করত। কুটীরগুলো প্রায়ই ছিল কাঠের তৈরী—কোনটা আবার পাথর দিয়ে তৈরী হত। ঘরের জানালাগুলো ছিল ছোট ছোট। জানালায় কাঠ বা কাঁচের কোন ঢাকা থাকত না। তার বদলে তেলে-ভেজা এক রকমের কাপড় লাগান থাকত।

কৃষকদের আর্থিক সংগতি মোটেই ছিল না। জমিদারেরা কৃষকদের কাছ থেকে অর্থ বা শস্যকর গ্রহণ করত। তারা জমির খাজনা ছাড়া কৃষকদের উপর নানা অজুহাতে গুরু করভার ও শুল্ক নিত। জমিদারেরা নানাভাবে কৃষকদের শোষণ করত। ভূস্বামীকে সামন্ত প্রথা অনুযায়ী কর, চার্চকে আয়ের $\frac{1}{10}$ অংশ এই দু'প্রকার কর ছাড়া নানা প্রকার কর দিতে হত। সুতরাং কর-ভারে ও উৎপীড়নে কৃষকদের মাথা তুলবার ক্ষমতা ছিল না। অর্থাৎ কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় ছিল।

গির্জা ও পুরোহিত

ম্যানরের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক গ্রামে একটা করে গির্জা স্থাপন এবং একজন করে পুরোহিত নিয়োগ। ফসলের একটা অংশ পুরোহিতের ভরণপোষণের জন্যে রাখা হত। কৃষকদের ফসল থেকে তা দিতে হত। পুরোহিতরা সামান্য লেখাপড়া জনতেন। তাঁরা

সন্ধ্যাবেলা কৃষকদের সঙ্গে ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতেন। সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর এইসব আলোচনা কৃষকদের জীবনে কিছুটা নতুন স্বাদ এনে দিত। পুরোহিতের মুখে শুনে ম্যানরবাসীরা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন। যারা রবিবারে গির্জায় যায় না অথবা মিথ্যা কথা বলে তারা মহাপাপী। মৃত্যুর পরে তাদের নরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পুরোহিত তাদের বুঝাতেন যে রোমের পোপ ঈশ্বরের প্রতিনিধি; পোপের কথা অমান্য করা মহাপাপ। পোপ মানুষকে স্বর্গের দরজায় পৌঁছে দিতে পারেন। তাই পুরোহিত পোপের নাম করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাদের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ আদায় করতেন। গ্রামবাসীরা অর্থ বা ফসল দিয়ে এই কর দিতে পারত।

জমিদারের দুর্গবাড়ী

জমিদারেরা নিজেদের জমিদারীর মধ্যে গ্রামে উত্তম ও সুবৃহৎ বাড়ীতে বাস করতেন। এগুলোর নাম ম্যানর হাউস। যে সব ম্যানরে শত্রুর আক্রমণের ভয় থাকত সেখানে জমিদারেরা দুর্গের মত করে প্রাসাদ নির্মাণ করত। প্রাসাদের দেওয়ালগুলো পুরু ও মজবুত করে তৈরী করা হত; যাতে শত্রুরা সহজে ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। দেওয়ালের উপরের দিকে থাকত ছোট ছোট জানালা এবং উপরে উঠবার সিঁড়ি থাকত আঁকাবাঁকা। দেওয়ালের চারদিকে জল ভর্তি পরিখা (খাল) ঘিরে থাকত। পরিখার উপরে সেতু থাকত। এই সেতুর উপর দিয়ে পার হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হত। শত্রুর আক্রমণের সময় সেতুটি টেনে খাড়া করে দিলে তোরণের ফটক বন্ধ হয়ে যেত। এইরূপ সেতুকে বলা হত—ড্র ব্রিজ্। সুতরাং এই সমস্ত দিয়ে এই প্রাসাদদুর্গ যুদ্ধের উপযোগী করেই তৈরী হত। মধ্যযুগে ইউরোপে এইরূপ বহু প্রাসাদদুর্গ নির্মিত হয়েছিল।

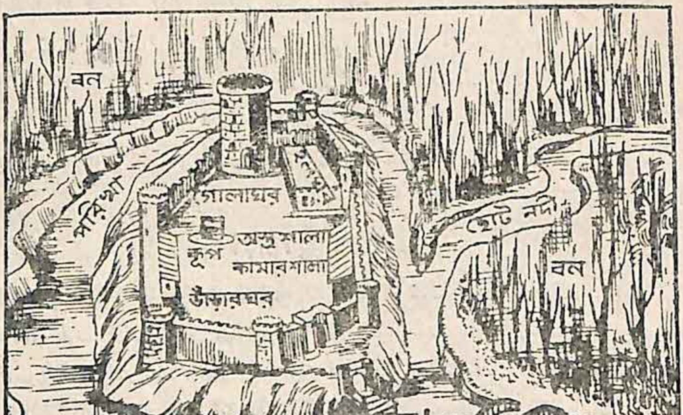
অধিবাসীদের শ্রেণীভেদ

মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজের অধিবাসীদের আমরা পরিষ্কার তিনটে ভাগে বিভক্ত করতে পারি, যথা—অভিজাত, যাজক ও অবশিষ্ট বা তৃতীয় শ্রেণী।

অভিজাত সম্প্রদায়

অভিজাত সম্প্রদায় বলতে রাজা ও রাজপরিবারের লোকজন, ডিউক, কাউণ্ট, আর্ল মার্কুয়িইস্, ল্যান্ডগ্রেভ্ উপাধিধারী ভূম্যধিকারিগণ, রাজকর্মচারী, ব্যারণ, সাধারণ নাইটগণ ও জমিদারগণকে বোঝায়। বিজিত দেশগুলো থেকে প্রচুর ধনাগম হত বলে ইউরোপের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্রাটগণ ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকতেন। পোপর সঙ্গে এদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগে থাকত। সামন্ত জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আসতো। তাছাড়া, অন্যান্য কর ও শুল্ক তো থাকতই। মধ্যযুগে ইউরোপের রাজনীতি ও ন্যায়নীতি খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান পোপ বা পবিত্র রোমান সম্রাটকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হত। ইউরোপের নরপতিরা নিজদিগকে খ্রীষ্টান ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের সভ্য বলে মনে করতেন। তারা মৌখিক বা লিখিত প্রতিশ্রুতির মর্যাদা দেওয়াকেই ধর্মের অঙ্গ বলে মনে

করতেন। রাজা ও তাঁর পরিবারের লোকজন বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকতেন। সরকারী কর্মচারী ঘুষ নিত এবং গরীবের অর্থ শোষণ করত, অথচ নিজেরা কোন কর দিত না



ম্যানর হাউস

তারাও বেশ সচ্ছল অবস্থার মধ্যে থাকতেন। ভূস্বামী সামন্তগণ ছিলেন রাজার ক্ষুদ্র সংস্করণ। এরা যুদ্ধ, লুটতরাজ ও শিকার করে কাল কাটাত। সব দায়িত্ব প্রজাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা নিশ্চিন্ত ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করত। কৃষকদের কাছ থেকে কর, বেগার নিয়ে আমোদ-প্রমোদ ও ভোজের ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য নিম্ন-ভূস্বামীদের অবস্থা মুখ্য-ভূস্বামীদের মত উন্নত ছিল না। এক কথায়, অভিজাত সম্প্রদায় বিনা আয়াসে সব সুখ-সুবিধা ভোগ করতেন।

যাজক সম্প্রদায়

যাজক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পোপ, আর্চবিশপ, বিশপ, অধস্তন পুরোহিত, মংক, ফ্রায়ার প্রভৃতি। পোপ রোমের ভ্যাটিক্যান প্রাসাদে থাকতেন। চার্চের নামে রাজ্যের অর্ধেক সম্পত্তি ছিল। এইসব সম্পত্তির জন্যে রাজাকে কোন কর না দিয়ে ভোগ করত। নিজেদের ভরণ পোষণের জন্যে কর, পোপের নাম বরাবর কর আরও নানারকম ধর্মীয় কর আদায় করে যথেষ্ট ভোগ সুখে থাকতেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারকম গোঁড়ামি, ব্যভিচার ও ভোগ-বিলাস ঢুকেছিল। বছরের অধিকাংশ সময় আমোদ-প্রমোদে রাজসভায় কাটাত। তাদের অসৎ আচরণ ও অধার্মিক জীবনযাত্রার ফলে তারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া, রাজার সঙ্গে গির্জার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মধ্যযুগে পূর্ণমাত্রায় ছিল।

অবশিষ্ট বা তৃতীয় শ্রেণী

স্বাধীন কৃষক ও ভূমিদাসদের নিয়ে অবশিষ্ট বা তৃতীয় শ্রেণী গঠিত ছিল। এদের দুর্দশার শেষ ছিল না। ইউরোপের অভিজাতবর্গ ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা যেন দুই বিপরীত মেরুতে বাস করত। অভিজাতেরা যেমন বিনা আয়াসে বিনা প্রতিদানে সব সুখ-সুবিধা ভোগ করতেন, অন্যপক্ষে অবশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা বহু বিধিনিষেধ জর্জরিত হয়েও সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়েও অভিজাতবর্গের সুবিধার উপকরণ যোগাত। এদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। অতিরিক্ত করভারে ও ঋণের দায়ে দরিদ্র কৃষক শ্রেণী একেবারে লোপ পেতে চলল। জমিদারেরা কৃষি ও অন্যান্য কাজ চালাবার ব্যবস্থা করল ক্রীতদাসদের দিয়ে। সর্বপ্রকারে তারা জমিদারদের অধীন ছিল। বেগার খেটেও তারা রেহাই পেত না। জমিদারের বাড়ী ও খেতে-খামারে কাজ করে দিতে হত। ফসল কাটার সময় জমিদারের ফসল তার নিজস্ব প্রাসাদের কাছে গোলাজাত করে দিত। ভূস্বামীর যাঁতাকলে তাকে শস্য ভাঙাতে হত, নিষ্পেষণ যন্ত্রে আঙুর নিষ্পেষিত করে মদ প্রস্তুত করতে হত এবং জমিদারের নিজেদের রুটি সেঁকতে হত। এইসব যন্ত্র নিজেদের বা অন্য কারও থাকলে সেখানে নিয়ে যাওয়ার অধিকার ছিল না এবং এইসব কাজ করবার জন্যে ভূস্বামীকে একটা মোটা কর দিতে হত। তাছাড়া কৃষককে বিনা পারিশ্রমিকে সপ্তাহে কয়েক দিন জমিদারের খেতে-খামারে ফসল কাটা, শাকসব্জি সংগ্রহ করা ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে দিতে হত। রাত্রিতে জমিদারের প্রাসাদ-দুর্গ পাহারা দেওয়াও তাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো ছিল বাধ্যতামূলক কাজ। জমি ছেড়ে দিয়ে তারা যে অন্য কোন উপজীবিকা আশ্রয় করবে তারও কোন উপায় ছিল না। পুরুষানুক্রমে তারা এই ভূমিদাসত্ব করত। ভূমিদাসের সন্তান ভূমিদাসই হত। তারা ছিল যেন সামন্ত প্রভুর দখলী স্বত্বে অস্থাবর সম্পত্তি। এইভাবে নানাবিধ করভার, বেগার পরিশ্রম, জমিদারের অন্যায় উৎপীড়ন, এবং নিজেদের অভাব ও দুর্দশায় তারা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। ফলে মনে মনে তারা কোন রকমের একটা পরিবর্তন চাচ্ছিল। স্বাধীন কৃষক ও সার্ফরা এই শোষণ, দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবন থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে লাগল।

দাসমুক্তি

ক্রীতদাসেরা তাদের দুঃখময় জীবন সহ্য করতে না পেরে মুক্তির জন্যে কয়েকটা পথ বেছে নিয়েছিল। প্রথমতঃ তারা পবিত্র ধর্মীয় সংস্থায় যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিল। তারা গীর্জায় যেত। পুরোহিতদের মুখ থেকে সুখ ও শান্তিময় জীবনের গল্প, শহরের বিলাস ও আমোদ-প্রমোদের গল্প তারা শুনতো। তারা দেখত গীর্জার অধীনে যেসব মঙ্ক, ফ্রায়াররা থাকত, তাদের উপর ক্রীতদাসদের মত অত্যাচার ও করভার ছিল না। কৃষিকাজ অপেক্ষা ধর্মচর্চার জীবন অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ মনে হত। তাই অনেকেই গীর্জার কাজে যোগদান করে মুক্তি পেয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ তারা সামন্তপ্রভুদের চোখে ধুলো দিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে শহরে পালিয়ে যেত। সেখানে তারা কোন ব্যবসায় অথবা ওস্তাদ কারিগরের অধীনে শিক্ষানবীসরূপে কাজ যোগাড় করে নিত। কখনও কখনও তারা শহরে শিল্প-কাজে নিযুক্ত হত। পুরোহিত-দের ও চারণ-কবিদের মুখ থেকে শহরের সম্পদ ও কর্মসংস্থানের কথা শুনত। তাই মোটামুটি জীবন-যাপনের বিকল্প আশ্রয় ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে সামন্তপ্রভুর জমিদারী ছেড়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু প্রভুরা অত সহজে ছেড়ে দিত না। ক্রীতদাসেরা ধরাও পড়ত। তাতে ম্যানরের বিচারালয়ে বিচার, যথেচ্ছা শাস্তিদান ও দৈহিক নির্যাতন পর্যন্ত চলত। তবে যারা শহরে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে পারত, তারা নির্যাতন থেকে রেহাই পেত।

শেষপর্যন্ত ইউরোপের ক্রীতদাসেরা সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ইতিহাসে ইহা "দাসবিদ্রোহ" নামে পরিচিত। রোমে জার্মান রাজা ও জমিদারগণ নিজেদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে একত্রে দাসবিদ্রোহগুলো দমন করেছিলেন। কিন্তু আবার দাসরা বিদ্রোহ করল। একটানা বিদ্রোহের ফলে দেশের বহু অর্থ ও লোকক্ষয় হল, রোম দুর্বল হয়ে পড়ল ও তার পতন ঘটল। রোমের পতনের পর ইউরোপে সামন্ত প্রথার সংস্কারে সম্রাটেরা ও জনগণ সচেষ্ট হলে সামন্তপ্রথা দুর্বল হয়ে পড়ল এবং এই প্রথার সবচেয়ে বড় ত্রুটি ক্রীতদাসপ্রথা তাও ক্রমশঃ শিথিল হতে থাকল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ইউরোপে কোন্ সময় সামন্তপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল?
২। চার্চ ধর্মের নামে কি পরিমাণ কর আদায় করত?
৩। ম্যানর কাকে বলে?
৪। কারা "নাইট" উপাধি দিতেন?
৫। দুর্গবাড়ীর তোরণের সেতুকে কি বলা হত?
৬। নাইটদের বিখ্যাত খেলার নাম কি?
৭। ভিল্যান কাদের বলা হত?
৮। পোপ কোথায় থাকেন?

৯। ইউরোপে মধ্যযুগে সবচেয়ে বড় জমিদার কে ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নঃ

১। সামন্ত প্রথার উদ্ভব কি করে হল?
২। ম্যানর কাকে বলে?
৩। নাইট কাদের বলে? নাইটদের অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।
৪। বীরধর্ম (শিভ্যালরি) কাকে বলে? নাইটদের কোন্ কোন্ গুণ বীরধর্মের অন্তর্গত ছিল?
৫। নাইটরা কিরূপ পোষাক পরত?
৬। মধ্যযুগে গ্রামগুলো স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল কেন?
৭। ভাট কাদের বলে? তাদের কি কাজ ছিল?
৮। গ্রামের শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল?
৯। দাস-বিদ্রোহ কাকে বলে?
১০। সার্ফ কাদের বলা হত?
১১। নাইটরা কি শপথ করত?
১২। "স্কোয়ার" কাদের বলে?
১৩। মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক বলা হত কেন?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। সামন্তপ্রথা কাকে বলে? এর প্রধান শর্ত কি কি?
২। জমিদারের দুর্গ-বাড়ীর বর্ণনা দাও।
৩। জমিদারের দুর্গ-বাড়ী ও সাঁজোয়া অশ্বারোহীদের দেশরক্ষায় কি ভূমিকা ছিল?
৪। জমিদারের ম্যানর জীবনের পরিচয় দাও।
৫। ইউরোপের অধিবাসীরা কয় ভাগে বিভক্ত ছিল? তাদের জীবন-যাত্রার পরিচয় দাও।
৬। কৃষকরা কয় ভাগে বিভক্ত ছিল? তাদের কাজের ও জীবন-যাত্রার বর্ণনা দাও।
৭। ভূমিদাসরা মুক্তি পেতে চেয়েছিল কেন? কি কি উপায়ে তারা মুক্তির সন্ধান করেছিল তার ব্যাখ্যা দাও।
৮। পুরোহিতদের স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থার পরিচয় দাও।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে ক্রুসেড্ একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ক্রুসেড্ কথাটার অর্থ ক্রুশের জন্য যুদ্ধ। ইউরোপের খ্রীষ্টানরা ১০৯৬ খ্রীঃ অঃ থেকে ১২৪৪ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল তাকেই ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধের পিছনে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়া ব্যক্তিগত স্বার্থ যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। নীচের বিষয়গুলোই ছিল ধর্মযুদ্ধের কারণঃ—

প্রথমতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভজনালয়গুলোর মধ্যে বহু দিনের যে দ্বন্দ্ব ছিল তার ফল হল ধর্মযুদ্ধ। খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের আধিপত্য বিস্তার হল ধর্মযুদ্ধের মূল কারণ। একাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার কারণ হল প্যালেস্টাইন ও তার আশেপাশের রাজ্যগুলিতে মুসলমানদের আধিপত্য খ্রীষ্টভূমি ইউরোপে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ খ্রীষ্টানদের তীর্থযাত্রার তীব্র প্রবণতা এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানরা জেরুজালেম বা প্যালেস্টাইনে পূর্বাপেক্ষা বেশী তীর্থযাত্রা করতে যেত। কিন্তু তখন জেরুজালেম তুর্কী মুসলমানদের অধিকারে ছিল। তারা খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর দুর্ব্যবহার এবং দস্যুবৃত্তি করত। এ সংবাদ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ায় সমগ্র খ্রীষ্টান জগতে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল।

তৃতীয়তঃ ধর্মযুদ্ধের কালে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচার ও গৃহযুদ্ধ ইউরোপে চলছিল। অভিজাত ও রাজপুত্রগণের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলছিল। শিভ্যালরি ও নাইট উপাধি লাভের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টান জাতিকে অনেকগুলো সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত করেছিল। পোপ ও গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা রাজা ও অভিজাত পরিবারের যোদ্ধাদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম উদ্ধারের জন্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রণোদিত করেছিল।

চতুর্থতঃ দশম শতাব্দীর পরবর্তীকাল থেকে মুসলমানেরা ভূমধ্যসাগরের উপর ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল। কিন্তু ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির বণিকদের বাণিজ্য ব্যাপারে ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বজায় রাখা একান্ত দরকার ছিল। এতে মুসলমান বণিকেরা বাধা সৃষ্টি করলে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে অসন্তোষ গড়ে উঠেছিল। ফলে তারাও ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেছিল।

সবশেষে উল্লেখ করা যায়, অ্যালেক্সিয়াস গোমেনাসের এশিয়ায় অধিকৃত স্থানগুলি সেলজুক তুর্কীরা দখল করে নেয়। তখন পোপ দ্বিতীয় আরবান ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে নভেম্বর ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ক্লারমেণ্টে এক মহাসভা আহ্বান করেন। গ্রীক চার্চকে নিজের অধিকারে আনার জন্যে সমগ্র খ্রীষ্টান জগৎকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আকুলভাবে আহ্বান জানালেন। তিনি ঘোষণা

করলেন যে বিধর্মীদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করা প্রত্যেক খ্রীষ্টানের প্রধান কর্তব্য। অথচ এই জেরুজালেম নগরে প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এজন্যে প্রথমে খ্রীস্টানেরা জেরুজালেমকে ঈশ্বরের অভিশপ্ত স্থান বলে মনে করত। কিন্তু অবশেষে তাদের এই ধারণার পরিবর্তন ঘটল—জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত হল।

আসলে ধর্মযুদ্ধের পশ্চাতে প্রজ্বলিত ধর্মোন্মাদনার সঙ্গে কতকগুলো নীচ উদ্দেশ্য কার্যকরী ছিল। স্বাধীন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ল্যাটিন চার্চের একটা স্থির ও পরিকল্পিত মতলব ছিল কেমন করে সম্রাট-শাসিত বাইজান্টাইন চার্চকে অধীনে এনে পরিবর্তন করা যায়। নরম্যানদের লুটতরাজ করার একটা সহজাত মনোবৃত্তি ছিল। ইটালীকে লুট করে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবার পর আরো নতুন ও সমৃদ্ধিশীল জগতের সন্ধান করছিল। তাই তাদের দৃষ্টি পূর্বদিকে পড়ল। প্রচারকদের আবেদন এবং নাস্তিকদের ভয় ও অ্যাচারের কাহিনী লুটেরাদের ঘৃণ্য ও অর্থের লোভ যেন আগুনে ঘিয়ের আহুতি দেওয়ার কাজ করলো। অসহিষ্ণু সেলজুক্ ও ফতিমাবাদীরা বাগদাদ ও মিশরের মধ্য দিয়ে পূর্বদিকে জেনোয়া ও ভেনিসের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। যদি পূর্বপ্রান্তের কন্‌স্টান্টিনোপল ও কৃষ্ণসাগরের পথে একচেটে আধিপত্য স্থাপন করতে হয় তবে এই বাধা সরিয়ে নতুন জলপথের সন্ধান করতে হবে। তাছাড়া, ১০৯৪ ও১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বোহেমিয়ায় পর্যাপ্ত মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ফলে উদ্বাস্তুর স্রোত যেন পূর্বদিকে বইতে শুরু করল। কিন্তু সবচেয়ে বড় স্বার্থ ছিল ধর্মযুদ্ধ করার প্রবণতা। প্রথমে একদল বিশৃঙ্খল জনতা পূর্বদিকে রওনা দিল এবং দানিয়ুব উপত্যকার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে কন্‌স্টান্টিনোপলের পথে পা বাড়াল। এরা কিন্তু সামরিক বাহিনী নয়। এদের কোন নেতাও ছিল না। তারা বিদেশীদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বুঝতে পারল তারা বিধর্মীদের মাঝে হাজির হয়েছে। আরো দুটো দল হাঙ্গেরীতে পৌঁছে হাঙ্গেরীয়ানদের উত্তেজিত করতে লাগল তারা যেন বিধর্মী মুসলমানদের হত্যা করে। কিন্তু তারা নিহত হল। এতে খ্রীষ্টান রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

প্রথম ক্রুসেড্

সেই সময় পোপের মত আর এক ব্যক্তি ইউরোপের জনগণকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী পিটার নামে পরিচিত। তিনি খালি পায়ে একটা খচ্চরের পিঠে চড়ে ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। লোকজনের জমায়েত দেখলে সেখানেই তিনি চীৎকার করে হাত পা নেড়ে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর তুর্কী মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে বক্তৃতা দিতেন এবং জনগণকে উত্তেজিত করতেন। তাঁর বক্তৃতার ধরণ, মুখের লম্বা দাড়ি এবং হাতে প্রকাণ্ড ক্রুশ-দণ্ড দেখে লোকে মনে করত পিটার নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রেরিত দূত। সেই সন্ন্যাসী পিটারের কানে খ্রীষ্টানদের হত্যাকাণ্ডের খবর এসে পৌঁছাতেই তিনি দুদল ধর্ম-

যোদ্ধাদের নিয়ে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছলেন। ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স, নরমাণ্ডি, ফ্ল্যাণ্ডার্স, ইংলণ্ড, দক্ষিণ ইটালী, সিসিলি প্রভৃতি দেশ থেকে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, জমিদারবর্গ এমনকি গুণ্ডাপ্রকৃতির লুটেরারাও কনস্টান্টিনোপলে দলে দলে আসতে লাগল। ইউরোপের রাজারাও হাজার হাজার নাইট ও সাধারণ সৈনিকদের ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে প্রথম ধর্মযুদ্ধ বেধে গেল। লুটতরাজ, বীভৎস হত্যাকাণ্ড, বিধর্মীদের রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে বসফোরাসে জাহাজে করে হাজির হল। এক বছর ধরে এই সংগ্রাম চলল। ইতিমধ্যে ধর্মযোদ্ধারা এ্যাণ্টিয়ক, নিকাইয়া দখল করে নিল। এ্যাণ্টিয়কে অবস্থানকারী একদল বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বুর্কিলিনের গড্‌ফ্রে জেরুজালেম আক্রমণ করলেন। এক মাসের অল্পাধিককাল নগর অবরোধ করে রাখলেন। বীভৎস হত্যাকাণ্ডে রক্তস্রোতে রাস্তাঘাট ডুবে গেল—স্রোতে নাকি ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। রাত্রিতে ধর্মযোদ্ধারা কবরের পাশে এসে রক্তমাখা হাতে প্রার্থনা করত। শেষ পর্যন্ত ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই গড্‌ফ্রে জেরুজালেম অধিকার করলেন এবং ঐ রাজ্যের রাজা হয়ে বসলেন। জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের দখলে এসে গেল।

তৃতীয় ক্রুসেড্

কিন্তু দীর্ঘদিন তারা এই অধিকার রক্ষা করতে পারল না। প্রায় ৯০ বছর পরে মিশরের সুলতান সালাদিন পুনরায় জেরুজালেম অধিকার করলেন। তখন জেরুজালেম উদ্ধারের জন্যে পোপ আবার ক্রুসেড্ ঘোষণা করলেন। তৃতীয় ক্রুসেড্ আরম্ভ হল। পোপের আহবানে হাজার হাজার খ্রীষ্টান বীরেরা টায়ার শহরে হাজির হলেন। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা, ইংলণ্ডের রাজা সিংহবিক্রম প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস তৃতীয় ক্রুসেডে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু রাজাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ছিল। বিরাট আয়োজন সত্ত্বেও তৃতীয় ক্রুসেড্ ব্যর্থ হল (১১৯২ খ্রীঃ)। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা এশিয়া মাইনরের এক নদী পার হবার সময় নৌকা ডুবিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং কোন পর্বত গুহায় শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছেন—যথা সময়ে জেগে উঠে পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট দূর করবেন! ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড ছিলেন বীর ও যুদ্ধপ্রিয়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তুর্কী সুলতান সালাদিন। তৃতীয় ক্রুসেডে রিচার্ড অসাধারণ বীরত্ব দেখান। কিন্তু তাঁর চেষ্টাও সফল হল না। তুর্কী বাহিনীর উদ্যম ও অদম্য উৎসাহ দেখে রিচার্ড সুলতান সালাদিনের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সন্ধি স্থাপিত হল এবং তৃতীয় ক্রুসেড্ থেমে গেল। দেশে ফেরবার পথে রিচার্ড অস্ট্রিয়ার রাজার হাতে বন্দী হন। ইংলণ্ডের লোকেরা অস্ট্রিয়ার রাজাকে প্রচুর টাকা দিয়ে অবশেষে রিচার্ডকে মুক্ত করে।

চতুর্থ ক্রুসেড্

তৃতীয় সুলতান সালাদিন মারা যাওয়ার দু'বছর পরে পোপ সিলেস্টাইন-এর প্ররোচনায় চতুর্থ ক্রুসেড্ আরম্ভ হয় (১১৯৫ খ্রীঃ অঃ)। অবশ্য তৃতীয় ক্রুসেডের



সালাদীন

অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের দ্বন্দ্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ধর্ম-যোদ্ধারা সিসিলি ও সিরিয়া অভিমুখে অভিযান চালালে সালাদিনের পুত্র আদিল তাদের বাধা দেন। শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টান যোদ্ধারা পিছিয়ে সরে আসতে বাধ্য হয় এবং ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। স্থির হয় আপাততঃ তিন বছরের জন্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

এইভাবে ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট আটবার ধর্মযুদ্ধ ঘটেছিল। তবে প্রথম দিকে ক্রুসেড্ যাত্রার জন্যে খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে উত্তেজনা জেগেছিল, শেষের দিকে তা প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। প্রথম ক্রুসেড্ ছিল আমেরিকা আবিষ্কারের মত একটা ঘটনা। পরবর্তীকালের ক্রুসেডগুলো ছিল অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরে বার বার অভিযানের মত। একাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডের ধারণা যেন আকাশে এক অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক আলোকের মত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সৎ নাগরিকেরা যেন

প্রতিবাদের সুরে বলত—"কি! আবার ক্রুসেড্!" আসলে, প্রাচ্যদেশ ভ্রমণের ফলে ধর্ম-যোদ্ধাদের মনে উদারতা ও বিচারবুদ্ধি জন্মেছিল। সংঘর্ষের পরে খ্রীষ্টান ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে। এতে হিংসা ও বিদ্বেষ অনেকটা কমে যায়। ফলে ক্রুসেডের অবসান ঘটে।

ক্রুসেডের ফলাফল

দেড়শো বছরের অধিককালব্যাপী এই খ্রীষ্টান ধর্মযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমতঃ সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছিল। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় জাতিগুলো এশিয়ার মুসলিম জগতের সংস্পর্শে আসে এবং তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এশিয়া ও ইউরোপের লোকেরা পরস্পরকে চিনতে পারল যখন বিধর্মীদের হত্যা করে ইউরোপের ধর্মপিপাসা মিটল। খ্রীষ্টানেরা মুসলমানদিগকে বিধর্মী আর মুসলমানরাও খ্রীষ্টানদের বর্বর বলে মনে করত। এশিয়া ও ইউরোপে পরস্পর যাতায়াতের ফলে ধর্মের উন্মাদনা দূর হয় এবং সমাজজীবনে উদারতা ও বিচার-বুদ্ধির উদয় হয়। ফলে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটল। প্রাচ্যের উন্নত ও অগ্রণী জাতির জ্ঞান পশ্চিম ইউরোপের জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাল। পশ্চিম ইউরোপ সুকুমার কলা ও শিল্প, বীজগণিত, আরবিক লিখন-পদ্ধতি, বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করল। সুতরাং ইউরোপের রেনেসাঁসের অভ্যুদয়ে ধর্মযুদ্ধ এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ বর্বরযুগের বহু বীর ধর্মযুদ্ধের বলি হয়েছিল। এরা ইউরোপে ব্যক্তিগত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ইউরোপে যে যুদ্ধপ্রিয়তা ও অশান্তির সৃষ্টি করত, ইউরোপ তার হাত থেকে অনেকটা রেহাই পেল। সমাজজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে যুদ্ধ-পীড়িত ইউরোপে ভিন্ন চিত্র দেখা দিল।।

তৃতীয়তঃ ধর্মযুদ্ধ ইউরোপে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করল। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠল। বিশেষতঃ ইটালীতে ভেনিস, জেনোয়া, সিসিলি, ফ্লোরেন্স, মিলান, নেপলস্ প্রভৃতি নতুন শহর গড়ে উঠল এবং বাণিজ্যের দিক দিয়ে এদের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। পূর্বে ইউরোপের প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। ধর্মযুদ্ধের ফলে মুসলমানদের কাছ থেকে ইউরোপীয়রা নাবিকদের দিগ্দর্শন যন্ত্র, বায়ুচালিত কল প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক কলকৌশল শিখে নিল। তারা প্রাচ্যের উন্নত কৃষি-পদ্ধতি এবং সমৃদ্ধিশীল শিল্প-ব্যবস্থার পরিচয় লাভ করল। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কুটির-শিল্পগুলো কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যখন তারা ইউরোপে ফিরে গেল, তারা নিজেদের দেশে প্রাচ্যের পণ্যের বাজার স্থাপন করল। পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা প্রাচ্য পণ্যের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে লাগল এবং এই প্রয়োজন থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যবিষয়ক কাজকর্মের উন্নতি ঘটতে লাগল। ফলে এশিয়া থেকে নতুন নতুন গাছপালা ও ফল, নতুন শিল্পদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, সূক্ষ্ম তুলার বস্ত্র, মসলা প্রভৃতি দ্রব্য ইউরোপের বাজারে প্রচলিত হল।

চতুর্থতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নৌ-বাহিনীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। তুর্কী মুসলমানেরা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তা ক্রমশই শিথিল হতে দেখা গেল। সে জায়গায় ইউরোপীয়রা ভূমধ্য-সাগরের জলপথ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে ঐ সাগরের বুকে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করল।

পঞ্চমতঃ খ্রীষ্টান ধর্মজগতে ধর্মযুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল। ধর্মযুদ্ধের পরে ল্যাটিন খ্রীষ্টান জগতের বিশপ, পুরোহিত ও ভজনালয়গুলোর প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেল। পোপ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার প্রতি আগ্রহী হল। সম্রাটেরা বিশপদের বিদেশী শক্তির প্রতিনিধি বলে সন্দেহ করতে থাকল। ধর্মজগতে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় পোপ অর্থের প্রয়োজনীয়তা বেশী পরিমাণে অনুভব করল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পুরোহিতেরা টাকার সন্ধানে ঘুরতে লাগল। চার্চ দশভাগের একভাগ কর ধার্য করল। এটা তাদের দাবী বলে ঘোষণা করল। সঙ্গে সঙ্গে এ দাবীও করল, সম্রাট যাজকসম্প্রদায়ের উপর কর ধার্য করতে পারবে না। সম্রাটদের সন্দেহ সমাজ-জীবনে ছড়িয়ে পড়ল। আবার রাজশক্তির সঙ্গে যাজকশক্তির সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ল।

সবশেষে, ধর্মযুদ্ধের সময় নাইটদের কতকগুলো ভ্রাতৃসঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাইট টেম্পলার ও নাইট হস্পিটালার। এই সঙ্ঘগুলোর সভ্যরা সাধু ও যোদ্ধা ছিল। এরা পোপের আজ্ঞাধীন থেকে নাইটদের মত যুদ্ধকে জীবনের ব্রত বলে মনে করত। কিন্তু এরা অর্থবান, প্রভাবশালী, আরামপ্রিয় এবং বিলাসী হয়ে পড়েছিল বলে কালে এই সঙ্ঘ দুটোকে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

ঘটনাপঞ্জী ঃ

১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দ—প্রথম ক্রুসেড্
১১৮৯ ,, —তৃতীয় ক্রুসেড্
১১৯৫ ,, —চতুর্থ ক্রুসেড্
১২৪৪ ,, —ক্রুসেডের অবসান (অষ্টম ক্রুসেড্)

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ক্রুসেড্ কত বছর চলেছিল?
২। প্রথম ক্রুসেড্ কত সালে শুরু হয়?
৩। কোন্ ক্রুসেড্ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ?
৪। তৃতীয় ক্রুসেড্ কত সালে আরম্ভ হয়েছিল?
৫। জেরুজালেম কি জন্যে বিখ্যাত?
৬। কোন্ খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ধর্মযুদ্ধের জন্যে ইউরোপীয়দের সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত করেছিলেন?

৭। সালাদিন কে ছিলেন?
৮। ইউরোপের কোন্ রাজাকে সিংহ-বিক্রম বলা হয়?
৯। ক্রুসেড্ মোট ক'বার হয়েছিল?
১০। যীশুখ্রীষ্ট কোথায় ক্রুশবিদ্ধ হন?
১১। পোপ দ্বিতীয় আরবান কোথায় মহাসভা আহ্বান করেন?
১২। কত সালে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে?
২। ইউরোপের কোন্ কোন্ রাজা ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করেছিলেন?
৩। তৃতীয় ক্রুসেডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৪। ধর্মযুদ্ধে কোন্ কোন্ পোপের নাম জড়িত?
৫। সন্ন্যাসী পিটার কিভাবে ইউরোপে ধর্মযুদ্ধের উত্তেজনা ছড়িয়েছিলেন?
৬। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপে কোন্ কোন্ শহর গড়ে উঠেছিল?
৭। ধর্মযুদ্ধের কালে উল্লেখযোগ্য ভ্রাতৃসংঘ কি কি? এদের উঠিয়ে দেওয়া হল কেন?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কি কি কারণে ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল?
২। ধর্মযুদ্ধের পশ্চাতে কোন্ কোন্ স্বার্থ কার্যকরী হয়েছিল?
৩। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মযুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেন?

বাম দিকের যে কথাটার সঙ্গে ডান দিকের যে নম্বরের উক্তিটা প্রয়োগ করা যায় সে নম্বরটা বন্ধনীর মধ্যে লেখ।

(ক) তৃতীয় সালাদিন ( ) ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বের একটি রাজ্য
(খ) সিলেস্টাইন ( ) ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী শহর
(গ) পিটার ( ) মিশরের সুলতান
(ঘ) ফ্রেডারিক বার্বারেসা ( ) খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী
(ঙ) মিলান ( ) পোপ
(চ) ক্লারমণ্ট ( ) জার্মানীর সম্রাট

নবম অধ্যায়

মধ্যযুগে ইউরোপের নগর-জীবন

নগরের উৎপত্তি

রোম সাম্রাজ্যের শহরগুলো বর্বর উপজাতিদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ইউরোপে শহর বলতে কিছুই ছিল না। তখন ম্যানর বা গ্রাম ছিল সমাজের ভিত্তি। একাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত শহরের উৎপত্তি ঘটতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধের পর থেকে শহর জীবনের শুরু হয় এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে উহা পূর্ণতা লাভ করে। বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার মধ্য দিয়ে শহরের উদ্ভব হয়েছিল। তখন জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্যে গ্রামের লোকেরা হাটে বা বাজারে মিলিত হত। দূর দূর গ্রাম থেকে তারা বাজারে আসত। ধর্ম অর্জনের জন্যে বড় বড় গির্জার মানুষ তীর্থযাত্রা করতে যেত। এসব লোকেদের খাওয়া থাকার জন্যে সেখানে দোকান-পাট, সরাইখানা ইত্যাদি স্থাপিত হয়। ক্রমে হাট-বাজার এবং গির্জাগুলোকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠতে থাকে।

কিন্তু মূল কারণ হল ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের পর ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের ভূমধ্যসাগরের উপর আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলোতে লোক সমাগম ঘটে। দেশী ও বিদেশী বণিকদের, কর্মচারীদের ও বন্দরের জাহাজগুলোর মাঝি-মাল্লাদের খাওয়া-থাকার জন্যে সরাইখানা গড়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে ঐসব স্থানে অট্টালিকা, মঠ, গির্জা, দুর্গ প্রভৃতি নির্মিত হতে থাকে। রাজা, ব্যবসায়ী, ধর্মযাজকেরা অপরের প্রয়োজনে ও নিজেদের স্বার্থে এগুলো নির্মাণ করতেন। এইভাবে দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কাল থেকে ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, জার্মানী, হল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্যে বহু সুন্দর শহর গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভেনিস, জেনোয়া, ভেরোনা, পিসা, ফ্লোরেন্স, নেপলস্, মিলান, মার্সেইলিস্, লিসবন্, আর্লিয়ঁ, প্যারিস, বোলন, লন্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ডোভার, সাউদাম্পটন, হ্যামবুর্গ, ব্রিমন, মিউনিখ, লিপজিগ, ডানজিগ, মাগডেবার্গ, প্রভৃতি শহর। এদের মধ্যে কোন কোন শহর আবার শিক্ষার পীঠস্থান অথবা রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠে।

নগরের গঠন ও নাগরিকজীবন

তখনকার দিনের শহরগুলো আজকালের শহর থেকে আয়তনে অনেক ছোট ছিল। কিন্তু সে অনুপাতে বেশী লোক বাস করত। বাড়ীগুলো কাঠের তৈরী এবং ঘেঁষাঘেঁষি। রাস্তাগুলো সরু সরু। রাস্তার দুধারে এলোমেলো বাড়ীর দোতলার বারান্দা এত ঝুঁকে থাকত যে উপর থেকে রাস্তা ঢেকে ফেলত। রাস্তার উপরে ভালো করে সূর্যের আলো পড়ত না। গায়ে উপর থেকে নোংরা, জল ও আবর্জনা পড়বার ভয়ে অথবা সরু রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়বার ভয়ে পথিকেরা রাস্তার ধার ঘেঁষে চল ফেরা করত। রাস্তাগুলো ছিল যেমন নোংরা, তেমন কর্দমাক্ত। রাস্তায় আধুনিক শহরের মত আলোর বা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে নর্দমার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

শহরগুলো চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। নগরের ফটক থাকত। রাত্রিবেলা ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হত। চৌকিদারেরা তখন লণ্ঠন হাতে শহর পাহারা দিত। তবুও শহরে চোর-ডাকাতের অভাব ছিল না। কেবল বড় বড় হোটেলের মালিকেরা দরজার সামনে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখত।

শহরের মধ্যে থাকত বাজার ও সরাইখানা, গির্জা, মঠ, শস্যাগার, হলঘর প্রভৃতি। প্রথমে চার্চের টাকায় অট্টালিকা তৈরি হত। পরে রাজা ও ব্যবসায়ীরাও নির্মাণ করতে শুরু করলেন। দুর্গ, প্রাসাদ ও গির্জায় গথিক শিল্পের সৌন্দর্য প্রকাশ পেত। শহরের প্রধান আকর্ষণ ছিল মেলা। এই মেলাতে আবার দেশ-বিদেশের বণিকেরা নানা জিনিসপত্র নিয়ে দোকান সাজাত এবং বড় রকমের বেচাকেনা চলত। মেলায় ভালুক নাচ, যাদুকরের খেলা, গান, বাজনা,, কুকুরের দৌড়, মোরগের লড়াই প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল।

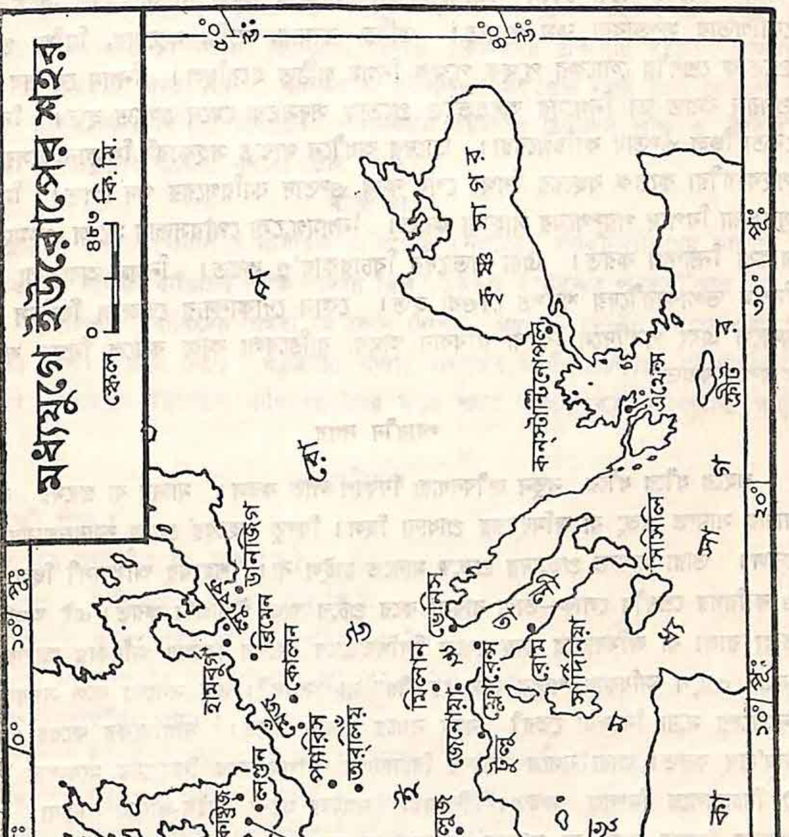
নগরে শাসনকর্তা মেয়র ও অলডারম্যান ছাড়া, ধনী বণিক, কারিগর, সুদক্ষ শিল্পী, ছাত্র এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার নাগরিকেরা বাস করতেন। নাগরিকেরা ধনী ও গরীব ছিল। ধনী নাগরিকেরা প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিল। এরা মাঝে মাঝে বড় বড় বণিক কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবসা করত। নগরে এদের বড় বড় অট্টালিকা ছিল। নগর-প্রাচীরের মধ্যে অট্টালিকার সামনে প্রকাণ্ড উঠানের উপর বিরাট গোলাবাড়ি ছিল। ধনীদের অট্টালিকাগুলো বর্তমান কালের শহুরে বাড়ির মতো সজ্জিত ও সুরক্ষিত ছিল না।। ভিতরের নির্মাণ-কৌশলে অনেক ত্রুটি থাকত। অধিকাংশ নিম্নস্তরের মানুষেরা ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করত। শহরের বাইরে প্রাচীরের গায়ে যেসব চালাঘর থাকত, তাতে এরা বাস করত। এরা নিম্নস্তরের শিল্পকার্য করেও অবশ্য কিছু কিছু রোজগার করত।

নগরের শাসন-ব্যবস্থা

নগরের শাসনব্যবস্থা যাদের হাতে থাকত তাদের বলা হত অলডারম্যান্। নগরের অধ্যক্ষকে মেয়র বলত। মধ্যযুগের নগরগুলোতে আধুনিক ধরনের পৌরশাসনব্যবস্থা ছিল। জমকালো পোশাক পরে মেয়র, অলডারম্যান্দের (পৌরসভার সদস্য) সঙ্গে নিয়ে নগরে ঘুরে বেড়াতেন। নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাদের অভিনন্দন জানাত। পৌরসভার কাজ হল নগরপ্রাচীর রক্ষা করা, জিনিসের মূল্য-তালিকা তৈরী করা এবং শহরে ভালো গুণের জীনিস বিক্রয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা। এ ব্যাপারে তারা নাগরিক সঙ্ঘের সঙ্গে একত্রে কাজ করত। জিনিসের দাম এমনভাবে ধার্য করত, যাতে জীনিসপত্রের মূল্য যেমন নিয়ন্ত্রিত হত তেমনি প্রত্যেক বিক্রেতা যাতে জীবিকা নির্বাহের মত চড়া দাম পায় সেদিকেও নজর থাকত। পৌরসভার সামাজিক কর্তব্যও ছিল, যেমন নগরের শস্যাগার পূর্ণ করার তদারকি করা, যাতে অভাবের বছরে খাদ্য সরবরাহ করা যায়। নগর ছিল প্রধান মূলধনী মহাজন। বাজারে প্রচুর টাকা ধার দেওয়া হত। এর বিনিময়ে পরিখা খনন করার জন্যে অথবা রাজার কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জনের মূলধন সংগ্রহ করত।

নাগরিক সংঘ বা গিল্ড ও তাদের কার্যকলাপ

নগরের বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী ও কারিগরেরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও পরস্পর



সাহায্য করার জন্যে সঙ্ঘ গঠন করত। এই সব সঙ্ঘকে বলা হত "গিল্ড্" বা "নিগম"। এই গিল্ড্ মধ্যযুগের নাগরিক জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। এদের লক্ষ্য ছিল দুটো:— সামন্ত প্রভুদের শোষণ প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করা। গ্রামে সামন্ত প্রভুরা ভূমিদাস বা সার্ফদের অথবা কারিগরদের শোষণ করত। তাই তারা আত্মরক্ষার জন্যে শহরে এসে

বাস করত এবং গিল্ডের সভ্য হত। দ্বিতীয়তঃ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমিয়ে দিয়ে নিজ নিজ ব্যবসায়ে উন্নতি করা গিল্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সে কারণে তারা নিগমের মধ্যে কোন অজানা-অচেনা লোককে নিতে চাইত না। এতে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা কম থাকত। তাঁতি, কামার, মুচি, কুমোর, মিস্ত্রি প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের পৃথক পৃথক নিগম গঠিত হয়েছিল। নিগম যে সব নিয়ম প্রণয়ন করত তা নিগমের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সদস্যকে মেনে চলতে হত। নিগমের নেতা ছিল ওস্তাদ কারিগরেরা। তাদের অধীনে থাকত সহকারী শিক্ষানবিসের দল। সহকারীরা কয়েক বছরের শিক্ষা শেষ করে ওস্তাদ কারিগরের পদ পেত। নিগমের সদস্যরা বিপদে পরস্পরের সাহায্য করত। নিগমগুলো পৌরসভার সঙ্গে একমত হয়ে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। এরা সভ্যদের বিচারকার্যও করত। নিগম অবহেলা করলে নিগম ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেওয়া হত। কোন দোকানদার ভেজাল জিনিস বিক্রী করলে এবং পর্বদিনে কিংবা রবিবার অথবা রাত্রিবেলা কাজ করলে নিগম শাস্তির ব্যবস্থা করত।

স্বাধীন নগর

শহরে ধীরে ধীরে নতুন জীবনধারা বিকাশ লাভ করল। ম্যানর বা গ্রামের জীবনযাত্রায় সামন্ত প্রভু বা জমিদারের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু শহরের লোক স্বায়ত্তশাসন দাবী করল। তারা সামন্ত প্রভুদের প্রভুত্ব মানতে চাইল না। শহরের অধিবাসী ছিল বণিক ও কারিগর শ্রেণীর লোক—তারা ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। এই অর্থ দিয়ে তারা রাজা বা জমিদারের কাছ থেকে লিখিতভাবে বিশেষ বিশেষ অধিকার আদায় করে নিত। এরূপ অধিকার পত্রের নাম "চার্টার" বা "সনদ"। এই সনদের বলে নগরবাসীরা নিজেদের মুদ্রা নিজেরা তৈরী করে নগরে প্রচলন করত। নাগরিকের করের পরিমাণ নির্ধারণ করত। তারা নগরে নিজস্ব বিচারালয় স্থাপন করে নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ ঐ বিচারালয়ে নিষ্পন্ন করত। নিজেরা নগরের জন্যে আইন-কানুন রচনা করত। অন্যান্য বিষয়ে রাজা বা সামন্ত প্রভুর শাসনমুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত।

কিন্তু ইউরোপের সর্বত্র নগরের স্বাধীনতা সমান ছিল না। ইংলণ্ডের রাজা শক্তিশালী ছিলেন ; তাই এখানে নগরের স্বাধীনতা কম ছিল। তবুও ইংলণ্ডে টেমস্ নদীর তীরে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার শহরে রাজা সাড়ম্বরে পাত্র-মিত্রসহ নগরের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতেন। সে তুলনায় জার্মানী ও ইটালীর বাণিজ্যনগরীগুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। বাল্টিক ও উত্তর সমুদ্রতীরবর্তী হামবুর্গ, ব্রিমেন, লিউবেক, কোলোন প্রভৃতি জার্মান শহরগুলো সন্ধিবন্ধ ছিল। এই সন্ধি (কনফেডারশন্)-র মধ্যে প্রায় সত্তরটি শহর ছিল। ভূমধ্য সাগর ও পূর্বদিকের সাগরগুলোতে জলদস্যুরা যে লুটতরাজ করত সে অভিশাপ দূর করে সেখানে নিরাপত্তা বিধান করেছিল। এই নগরগুলো ছিল প্রধানতঃ বাণিজ্যকেন্দ্রিক। এগুলো রাজার কাছ থেকে চার্টারের মারফত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেছিল এবং বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়েছিল।

মধ্যযুগে ইটালীর নাগরিক জীবনে সবচেয়ে পূর্ণ ও সুন্দর উন্নতি দেখা দিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন জার্মান সম্রাটেরা ইটালী শাসন করছিলেন তখন বহু অর্ধ-স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র রোমের উত্তরে গড়ে উঠেছিল। জেনোয়া ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেনিস ছিল সে সময়ের বাণিজ্যের বড় সামুদ্রিক বন্দর। ঐ দুটো শহরের প্রাসাদগুলো এবং ওদের ভিতরের রাজসিক চিত্রগুলো আজও আমাদের প্রশংসার বস্তু। মিলান সম্পদে ও ক্ষমতায় উন্নত ছিল। বাণিজ্য ও ধন-সম্পদে সর্বশ্রেষ্ঠ নগর ছিল ফ্লোরেন্স। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেডিচি পরিবারের শাসনকালে ইটালীর ফ্লোরেন্স শক্তি ও ঐশ্বর্যে দ্বিতীয় "পেরিক্লিসের যুগের" মর্যাদা ভোগ করত।

বুর্জোয়া

বুর্জোয়া বলতে (ফরাসী) নাগরিক বা বর্গের (নগরের) স্বাধীনব্যক্তিদের বোঝাত। এরা কৃষক ও সাধারণ ব্যক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকাল থেকে বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অথবা যে কোন দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসাদারদের বুর্জোয়া বলে। তখন থেকে বুর্জোয়া শব্দটি সমাজের মধ্যবিত্তশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের বোঝায়। মধ্যযুগে ইউরোপে বাণিজ্যপ্রসারের ফলে শহর অঞ্চলে বুর্জোয়া-গোষ্ঠি গড়ে ওঠে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। নগরের অধ্যক্ষকে কি বলা হত?
২। বণিক ও কারিগরদের সঙ্ঘের নাম কি?
৩। বণিক ও কারিগরদের অধিকার-পত্রের নাম কি?
৪। কোন শহর দ্বিতীয় "পেরিক্লিসের যুগের" মর্যাদা ভোগ করত?

সংক্ষিপ্ত-উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগে ইউরোপে নগরের উদ্ভবে ধর্মযুদ্ধের কিরূপ ভূমিকা ছিল?
২। মধ্যযুগে ইউরোপে গঠিত কয়েকটি শহরের নাম লিখ।
৩। শহরের মেলায় আমোদ-প্রমোদের কি ব্যবস্থা ছিল?
৪। স্বাধীন নগরগুলোর কি কি অধিকার থাকত?
৫। নগরের রাস্তাঘাট কেমন ছিল?
৬। "বুর্জোয়া" কাদের বলা হত?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মধ্যযুগে ইউরোপে কি কি কারণে নগর গড়ে উঠেছিল?
২। ইউরোপে ঐ যুগের নগরের গঠন ও শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান?
৩। গিল্ড্ কাকে বলে? এর কাজ কি কি ছিল?
৪। নগরবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যা জান লিখ।
৫। নগরগুলো কি ভাবে স্বাধীনতা অর্জন করত এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ইহা ভোগ করত?
৬। জার্মানী ও ইটালীর স্বাধীন নগরগুলোর পরিচয় দাও।

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগে দূর-প্রাচ্য

চীনের ইতিকথা

মধ্য এশিয়ার তাতার জাতির আক্রমণে চীনদেশ ধ্বংস হয়ে যাবার পর সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনে তাঙ্, সুঙ্ ও য়ুয়ান্ বংশ রাজত্ব করেছিলেন। তাদের আমলে চীনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য ক্রমবিকাশ ঘটেছিল।

(ক) তাঙ্ বংশ

মহারাজ হর্ষবর্ধন যখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে শাসনকার্য চালাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঙ্ বংশ চীনের শাসনভার গ্রহণ করেন। এ হল সপ্তম শতাব্দীর কথা। এই বংশ তিন শতাব্দী (৬১৮ খ্রীঃ অঃ—৯০৭ খ্রীঃ অঃ) চীন শাসন করেছিলেন।



তাই সুঙ্

৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঙ্ বংশ চীনের সিংহাসন অধিকার করেন। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন তাই-সুঙ্। তিনি ৬২৭ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনদেশে রাজত্ব করেছিলেন। তিনিই ছিলেন তাঙ্ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

তাই-সুঙ্ দুর্ধর্ষ তাতার জাতিকে পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণে আন্নাম থেকে

পশ্চিমে কাসাপিয়ান সাগর পর্যন্ত, পারস্য থেকে উত্তরে আলতাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কোরিয়া তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাঁর পুত্র কোরিয়াকে জয় করেছিলেন। তাই-সুঙের চেষ্টায় সমগ্র চীন ঐক্যবন্ধ হল। বর্তমানে চীন দেশ বলতে যে বিরাট ভূখন্ড বুঝায়, তাই-সুঙের রাজত্বকালে তার সৃষ্টি হয়েছিল। এখানেই চীনের সঙ্গে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সাদৃশ্য ও পার্থক্য। রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হয়েছিল। চীনও উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাই-সুঙের আমলে চীন ঐক্যবন্ধ হয়; কিন্তু ইউরোপে আজও তা সম্ভব হয়নি।

তাই-সুঙ্ চীনে আইন-কানুন প্রণয়ন করেন। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। তিনি চুরি-ডাকাতি বন্ধ করবার জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করে প্রজাদের করভার কমিয়েছিলেন, সৎ--প্রকৃতির রাজকর্মচারী নিয়োগের নির্দেশ দিলেন, প্রজাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করলেন।

তাই-সুঙের আমলে শিক্ষার উন্নতি হয়েছিল। সে সময়ে চীনে প্রথম কাগজ প্রস্তুত হতে লাগল। কাঠের ব্লকে ছাপার কাজ আরম্ভ হল। সরকারী চাকুরির জন্যে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা হল। চীনের প্রাচীন গ্রন্থগুলো সম্পূর্ণ এবং যথাযথভাবে পুনরায় ছাপা হতে লাগল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইতিহাস, আইন ও প্রাচীন সাহিত্যে লিখিতভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

তাই-সুঙ্কে চীনের লোকেরা "সিঙ্ হোয়াং" অর্থাৎ "সম্রাট শিরোমণি" আখ্যা দেন। জোরাষ্টিয়ান, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ তাঁর সভায় এসেছিলেন। তাঁর রাজসভায় পারস্য ও কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট দূত পাঠিয়েছিলেন। তাই-সুঙ্ সকলকে সমান আদরে গ্রহণ করে তাঁদের মুখ থেকে নিজ নিজ ধর্মের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের ভিতরে খ্রীষ্টানেরা গীর্জা ও মুসলমানেরা মসজিদ তৈরি করবার অনুমতি পেয়েছিল। আজও সে মসজিদ চীনে আছে। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নতুন ধর্মমত চীনে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি একটি গীর্জা ও একটি মঠ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। আজও সিয়ানফুতে একটা খোদাই করা প্রস্তরখন্ড আছে যাতে চীনা ভাষায় এই ঘটনার কথা বিবৃত আছে। প্রস্তরখন্ডে ৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে।

তাই-সুঙের পরবর্তী শাসকগণ

তাই-সুঙের মৃত্যুর পর বিধবা সম্রাজ্ঞী উ-কৌ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ৬৮৪ খ্রীঃ অঃ থেকে ৭০৫ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য চালান। তিনি বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর পুত্র মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন। পরে তাই-সুঙের ভ্রাতুষ্পুত্র হুয়ান সুঙ্ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর রাজ্যশাসন করেন। তাঁর শাসনকালে চীনে শিল্প-কলার ও কাব্যসাহিত্যের উন্নতি ঘটে। কবি লি-পো এবং তু-ফো তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। লি-পো ছিলেন তাঙ্ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি একজন বড় পন্ডিত

ছিলেন। কোরিয়ার দূত চীনের দরবারে যে লিপি এনেছিলেন লি-পো তার পাঠোদ্ধার করেন। এতে তাঙ্ সম্রাট খুব খুশী হন। কবি ক্রমেই রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন। তিনি রাজার সভাকবি হিসেবে বহু কবিতা রচনা করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে গল্প আছে যে, জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ কবি চাঁদকে আলিঙ্গন করবার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলেন, আর তিনি উঠলেন না।

তাঙ্ বংশের পতন

দশম শতাব্দীর মধ্যেই শক্তিশালী তাঙ্ বংশের পতনের সূত্রপাত হয়েছিল। এই বংশের অন্যতম শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন সিঙ্-হুয়াং। এই বংশের শেষের দিকে দুর্বল, অক্ষম ও বিলাসী সম্রাটের আবির্ভাব ঘটায় তাঙ্ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ও দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে হুসুয়ান-সুঙ্-এর রাজত্বকালে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। আন্-লুসান ও হুয়াং তাসো দুবার রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এই বিদ্রোহ ৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। এর সাতাশ বছর পরে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শাসন-ক্ষমতা লিয়ং নামে এক রাজপুত্রের হাতে চলে যায়। তাঁর বংশ তাঙ্ ও সুঙ্ বংশের মধ্যবর্তী কালে রাজত্ব করেন।

সুবর্ণযুগ

তাঙ্ বংশের সম্রাটগণ প্রায় তিনশো বছর রাজত্ব করেছিলেন। চীনের ইতিহাসে তাঙ্যুগ "সুবর্ণযুগ" নামে খ্যাত। শুধু সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন-পদ্ধতির দিক দিয়ে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মেও এ সময় চীন চরম উন্নতি লাভ করে। এই উন্নতির মূলে ছিল চারটি উপাদান—চীনের উদার সংস্কৃতি, প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও উত্তর চীনের সাহসিকতা।

ব্যবসা-বাণিজ্য

তাঙ্ যুগে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। চীনের বাণিজ্য-তরী সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। দেশে রেশম শিল্পের খুব প্রসার হল। রেশম, মশলা, কৃষিজাত শস্য প্রভৃতি পণ্য-বোঝাই চীনের বাণিজ্য-জাহাজ ভারত মহাসাগর ও পারস্য সাগরের উপর দিয়ে দূর দেশে যেত। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে চীন খুব সমৃদ্ধ হয়েছিল। দেশে কৃষির উন্নতির ফলে দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য ছিল। চীন অল্প সম্পত্তির দেশ। কৃষিতে সকলের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তাঙ্ যুগে সকলকেই প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকতে হত। এই সময়েই চীনে চা-পান প্রচলিত হল। কাগজ বানাবার পদ্ধতি চীন থেকে আরবদের মারফতে ইউরোপে গেল। এই সময় চীন বারুদ তৈরি, গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার, সেতুনির্মাণ ও বায়ুচালিত যন্ত্রনির্মাণ করতে জানত।

শিল্প

চীনের চিত্রশিল্প তাঙ্যুগে চরম উন্নত ছিল। শিল্পীরা জল-রঙের ব্যবহার

করত। রেশম ও কাগজের উপর চিত্র আঁকা হত। ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পও উন্নত ছিল। ইয়েন লি-পেন, লি চেন, ওয়াং উই—তাঙ্ যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। চীনামাটির বাসন, মূর্তিগুলো প্রচণ্ড তাপে পোড়ান হত। সেগুলোতে সূক্ষ্ম কাজ থাকত। পোর্সিলিনের জিনিসগুলো খুব ভাল ছিল। তাঙ্ যুগের অসংখ্য পরিচারক, ঘোড়া, উট প্রভৃতি পোড়া মাটির জিনিস বর্তমানেও ইউরোপের প্রাচীন পরিবারে ও সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দর শিল্পের পাশাপাশি মধুর কাব্যেরও অনুশীলন ঘটে।

ধর্ম

তাঙ্ যুগে চীনে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তাঙ্ সম্রাটগণ ভারতে ধর্ম-প্রচারক পাঠাতেন। বিশেষ করে,, হিউয়েন সাঙ্ তাই সুঙের সময়ে চীনে প্রত্যাবর্তন করলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি চীনাদের গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে।

সুতরাং চীনে তাঙ্ যুগ সমৃদ্ধি, সুখ ও শিল্পকার্যে সমসাময়িক রাষ্ট্রগুলোর বহু ঊর্ধ্বে ছিল। তাঙ্ যুগে চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এরূপ বিকশিত হয় যে ধীরে ধীরে তা আনাম, কাম্বোডিয়া, জাপান, শ্যাম, তিব্বত নেপাল ও কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি চীনের লিপি ও বর্ণমালা কোরিয়া ও জাপান অনুসরণ করেছিল। তাঙ্ সম্রাটগণ কোরিয়া ও "উদীয়মান সূর্যের দেশ" জাপানে দূত প্রেরণ করতেন। ফলে ঐসব দেশের সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির এমন পরিবর্তন ঘটেছিল যে দূতেরা আর চীনে ফিরে আসত না। সব দিক দিয়ে তাঙ্ যুগের চীন ছিল পৃথিবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা অনুকরণের আদর্শ।

হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণ এবং তার প্রভাব

হিউয়েন সাঙ ছিলেন একজন চীনা পণ্ডিত ও পর্যটক। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের জন্মস্থান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে দর্শন এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের আমলে ভারতে আসেন। তাঙ্ যুগে চীন দেশে বিদেশ-ভ্রমণ নিষিদ্ধ থাকায় হিউয়েন সাঙ্ একদিন রাতের অন্ধকারে বিদেশের পথে বার হয়ে পড়লেন। প্রথমেই তাঁকে গোবি মরুভূমি অতিক্রম করতে হয়েছিল। এ সময় পথ হারিয়ে পাঁচদিন পর্যন্ত এক ফোঁটা জলও পান করতে পারেননি। মৃত মানুষ ও ঘোড়ার হাড় পড়ে থাকতে দেখে তিনি পথ চিনতে পারেন। মরুভূমির পর উঁচু পর্বতের মধ্য দিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করে তিনি তুর্কীস্থানে প্রবেশ করলেন। তুর্কীদের খান বা রাজা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর তিনি খানকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিলেন। তুর্কীস্থান থেকে হিউয়েন সাঙ্ সমরখন্দে উপস্থিত হলেন। বাহ্লীক দেশে কিছুদিন অবস্থান করবার পর হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে তিনি খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে পৌঁছলেন।

হিউয়েন সাঙ্ ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৪ বছর ভারতে



হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ পথ

চীন হইতে ভারত ⟵ ভারত হইতে চীন ⟶

কাটিয়েছিলেন। তিনি নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। এর মধ্যে বেশীর ভাগ সময় হর্ষবর্ধনের অতিথি হিসেবে প্রাসাদে এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে কাটিয়েছিলেন। তারপর ১৬ বছর পরে কুড়িটা ঘোড়ায় করে একশো-খানা সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, তালপাতা ও গাছের ছালে লেখা বহু পুঁথি, সোনা, রুপো, চন্দনকাঠ এবং পাথরে নির্মিত বহু বুদ্ধমূর্তি, একশোটা বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে চীনের রাজধানী সিয়ান-ফুতে ফিরে গেলেন। চীন সম্রাট তাই-সুঙ্ এখন বন্ধু হিসেবে হিউয়েন সাঙ্‌কে সাদরে রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা জানালেন। আগমনের দিন রাজপথ পতাকা দিয়ে সজ্জিত এবং সঙ্গীতে মুখরিত করা হয়েছিল এবং ঐ দিনটা ছুটির দিনও ছিল। সম্রাট প্রাসাদে দিনের পর দিন ভারত সম্রাট সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, কিন্তু হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বলতে থাকেন। তাই-সুঙ্ ইসলাম, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে সমান অনুরাগী ছিলেন। তিনি ধর্মীয় সমদৃষ্টির জন্যে হিউয়েন সাঙ্‌কে সন্ন্যাসীর জীবন ত্যাগ করে বৈদেশিক বিভাগে সরকারী কর্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু হিউয়েন সাঙ্ তা তখনি প্রত্যাখ্যান করে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করে মঠে চলে আসেন। অবশ্য তাই-সুঙের অনুরোধে তিনি অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন এবং হিউয়েন সাঙের অনুরোধে তাই-সুঙ্ এবং হর্ষবর্ধনের মধ্যে দূত বিনিময় চলেছিল।

চীন দেশের ইতিহাসে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণের গুরুত্ব সর্বাধিক। বৌদ্ধ ধর্মের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হিউয়েন সাঙের আগমন-পথ অনুসরণ করে ভারত ও চীনের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। তাছাড়া, হিউয়েন সাঙ্ চীনে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা এবং ঐ ধর্ম প্রচার করায় তাঁর বহু শিষ্য হয়েছিল। চীন দেশে বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল।

(খ) সুঙ্ বংশ

চীনের উত্তর-পশ্চিমে তাতার রাজ্য এবং উত্তরে কিন্ রাজ্য ছিল। এই দু'রাজ্যের মধ্যে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের অল্প পরে রাজদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এক অবসর-প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই রাজদ্রোহী দেশ-প্রেমিক ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। এভাবেই সুঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই বংশের রাজারা তিন শতাব্দী ধরে (৯৬০ খ্রীঃ অঃ—১১২৭ খ্রীঃ অঃ) রাজত্ব করেছিলেন। চীনের ইতিহাসে এ'রা উত্তর সুঙ্ নামে পরিচিত। তাঁরা চীনে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু হূণদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ বাধে। চীনের পূর্ব উপকূলে হানাদারেরা চাপ সৃষ্টি করলে সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কিন্ সাম্রাজ্যে হূণদের আধিপত্য স্থানান্তরিত হয়। ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সুঙ্ সাম্রাজ্যের রাজধানী চীনের উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি নানকিনে

স্থানান্তরিত হয়। ১১২৭ খ্রীঃ অঃ থেকে ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকাল পর্যন্ত সুঙ্ বংশ দক্ষিণ সুঙ্ নামে পরিচিত হয়।

শিক্ষা

সুঙ্ যুগ চীনের ইতিহাসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যে প্রসিদ্ধ। শিল্পকলা, শিক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান একাদশ শতাব্দীকে কেন্দ্র করে পূর্ণরূপ লাভ করেছিল। এ যুগে নব-কন্‌ফ্যুসিয়াস্‌বাদীরা চীনে কন্‌ফ্যুসিয়াস্-প্রবর্তিত শিক্ষাদান-ব্যবস্থার উপর অধিক মনোযোগ দেন। পণ্ডিত ও গুরুদের কেন্দ্র করে তাঁরা পাঠচক্র তৈরি করতেন। তারা সরকারী চাকরির জন্যে যে গোপন পরীক্ষা হত, তার উপযোগী করে ছাত্রদের তৈরি করতেন। সম্রাটগণও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং শিক্ষা ও শিল্পকলার জন্যে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সুঙ্ সম্রাট হুই-সুঙ্ নিজে একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি চিত্র-শিল্প শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এক বিদ্যায়তন স্থাপন করেছিলেন। সেখানে কৃতী ছাত্রদের সম্মানসূচক ডিগ্রী দেওয়া হত।

বিখ্যাত লেখক স্যু-মা-কুয়াঙ্ পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চীনের ইতিহাস রচনা করেন। তাই-পিং-য়ু-লান্ দশম শতকের শেষ ভাগে শব্দকোষ রচনা করেন। চু-সি (১১৩০–১২০০ খ্রীঃ) সকল মতবাদের সমন্বয় করে দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন।

অর্থনীতিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ

সম্রাট শেন্-সুঙ্-এর প্রধানমন্ত্রী ওয়াং-আন্-শি ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের অর্থনৈতিক অবস্থার সংস্কার সাধন করেন। তিনি ভূ-সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পর্কে যে সমস্যা ছিল তার সমাধানে নতুন এবং কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। তিনি দেশের কৃষিব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেন। তবে তিনি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনেননি, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনেন। দেশের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা করেন, প্রতি জেলায় সরকারী শস্যগোলা স্থাপন করেন। বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যশস্য বণ্টন করা হত। উদ্বৃত্ত হলে সরকার থেকে কিনে গুদামে মজুত রাখা হত, আর ঘাটতি হলে সেই খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে ঘাটতি অঞ্চলে বিক্রি করে অভাব পূরণ করা হত।

রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষিঋণ দানঃ পূর্বে কৃষকেরা জমি বন্ধক রেখে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করত। এই ঋণ পরিশোধ করা তাদের পক্ষে প্রাণান্তকর ব্যাপার ছিল। ওয়াং খুব কম সুদে কৃষকদের মধ্যে সরকারী ঋণ দানের ব্যবস্থা করেন। বীজবপন থেকে শস্যকর্তন পর্যন্ত ঋণ হিসাবে যে অগ্রিম দেওয়া হত তাকে "সবুজ শস্য ঋণ" বলা হত।

সম্পত্তির উপর ধার্য করঃ সে সময়ে সম্পত্তি বলতে জমিকেই বোঝাত। জমির উপর ন্যায্য কর ধার্য করার জন্য ওয়াং ভূমি জরিপ করে উর্বরতা অনুসারে জমি-

গুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। অনুর্বর বা লোনা জমি, পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি করমুক্ত ছিল, ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে খাজনার হিসেব-নিকেশ হত। চীনে এইসব সংস্কার ছিল নতুন। এইসব নববিধান জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর ছিল বলেই দেশের কোথাও কোনরূপ বিদ্রোহ বা উপদ্রব দেখা দেয়নি। সুং যুগে যে একটানা শান্তি বিরাজ করছিল তা এইসব নববিধানের প্রতি জনসমর্থনেরই ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগদান করে প্রধানমন্ত্রীর সংস্কারগুলোকে বাধা দেয়। ফলে নূতন সংস্কারগুলো কার্যকরী হবার সুযোগ না পাওয়ায় ধীরে ধীরে উঠে যায়।

সুঙ্ যুগের বাণিজ্য

সুঙ্ বংশের আমলে চীন বিদেশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেও চীনে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল এবং ইন্দোনেশিয়া, ভারত, লোহিতসাগর এবং পারস্য উপসাগর হয়ে বাণিজ্য-পোত যাতায়াত করত। চীনের বাণিজ্য-জাহাজ বসরা পর্যন্ত যেত এবং আরব ও পারস্যের বহুসংখ্যক বাণিজ্য-জাহাজ চীনের ক্যাণ্টন ও প্রতিবেশী বন্দর-গুলোতে আসত। ফলে দক্ষিণের প্রদেশগুলো থেকে বাণিজ্য মারফত প্রচুর সম্পদ চীনে আসত।

সুঙ্ যুগের সংস্কৃতি

সুঙ্ যুগে চিত্রকলা বিখ্যাত ছিল। এ যুগে বিখ্যাত উত্তর সুঙ্ চিত্রশিল্পী কুয়ানতুঙ্, ফান্, কুয়ান্ ও তুঙ্ য়ুয়ান। তুঙ য়ুয়ানের বিখ্যাত চিত্র হল "উপত্যকায় মধুর আবহাওয়া"। দক্ষিণ সুঙ্ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে সিয়া কুই (১২৩০ খ্রীঃ) ও মা য়ুয়ান উল্লেখযোগ্য। মানুষ ও প্রকৃতির মিলন ছিল চিত্র-শিল্পের বিষয়বস্তু। চিত্রগুলো রেশমী কাপড়ের উপর আঁকা হত। চেন্‌জুং, চাও-মেঙ্ প্রভৃতি শিল্পীরা ড্রাগন, বাঁশ, পাখী, ফুল প্রভৃতি চিত্র অংকনের মধ্যে প্রাকৃতিক রহস্য ও বিশ্ব-আত্মার মিলনের প্রকাশ দেখান।

সুতরাং চীনের ইতিহাসে সুঙ্ বংশের তিন শতাব্দীব্যাপী রাজত্বকাল সুখ-সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির যুগ বলে গণ্য হয়।

(গ) য়ুয়ান বংশ

মোঙ্গল (বা মোগল) জাতিঃ কুবলাইখান

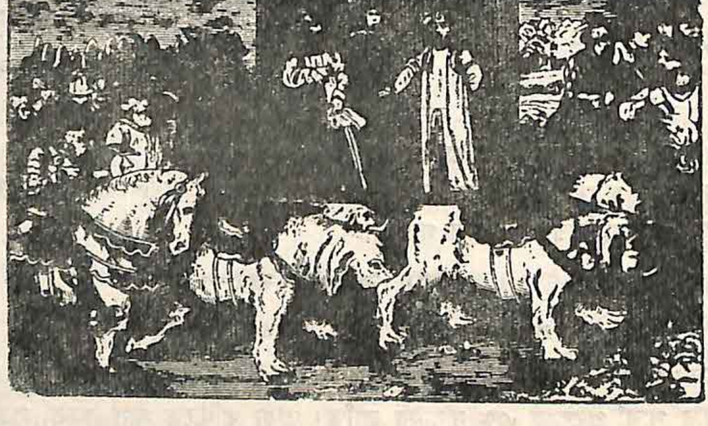
মোঙ্গলদের প্রাচীন ইতিহাসের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তারা মধ্য এশিয়ার পূর্ব প্রান্তের এক যাযাবর জাতি। তারা তাঁবুতে বাস করত, সঙ্গে থাকত পশুর পাল। যখন যেখানে পশু পালনের সুবিধা হত, সেখানেই তারা তাঁবু ফেলত। মাংস ও ঘোড়ার দুধ ছিল মোঙ্গলদের প্রধান খাদ্য। পশুচারণ ও শিকার ছিল তাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন। যোদ্ধা ও অশ্বারোহী হিসেবে এরা বিখ্যাত। এদের

প্রধান অস্ত্র ছিল তীর ও ধনুক। পরবর্তীকালে এরা বন্দুকের ব্যবহার শিখেছিল। মোঙ্গল জাতি ছিল সামানী বৌদ্ধ ধর্মাশ্রিত। এরা চীন জয় করে চীনের সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে চৈনিক হয়ে গিয়েছিল। এরা পোল্যান্ড জয় করে কমাক এবং খলিফার সাম্রাজ্য জয় করে মুসলমান জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এরা যদি ভারতবর্ষ জয় করে এদেশে বাস করত তবে এরা হয়ত ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করত। মোঙ্গলদের বর্বর জাতি মনে করা ভুল হবে। এরা কিন্তু মুসলমান নয়। এরা নীল আকাশের আরাধনা করত। এই জাতির মধ্যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ছিল।

দিল্লীতে যখন দাস বংশের সুলতানেরা রাজত্ব করছিলেন, তখন চেঙ্গিস খান নামে একজন দিগ্বিজয়ী মোঙ্গল-নেতার জন্ম হয়। তিনি সমগ্র মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য দেশ নিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কারাকোরাম। তিনি পিকিং ও চীনদেশের অনেকাংশ অধিকার করেন। এই দুর্ধর্ষ বীরের নাম এশিয়ার রাজশক্তিগুলোর কাছে আতঙ্কের বিষয় ছিল ; চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর সমগ্র চীন, তিব্বত, পারস্য, আফগানিস্তান, পোল্যান্ড মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চেঙ্গিসের পৌত্র হলাগু মুসলমানদের আক্রমণ করে বাগদাদ দখল করেন। অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে টাইগ্রিস নদীর জল মানুষের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সময়ে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের আয়তন রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন অপেক্ষা অনেক বড় ছিল।

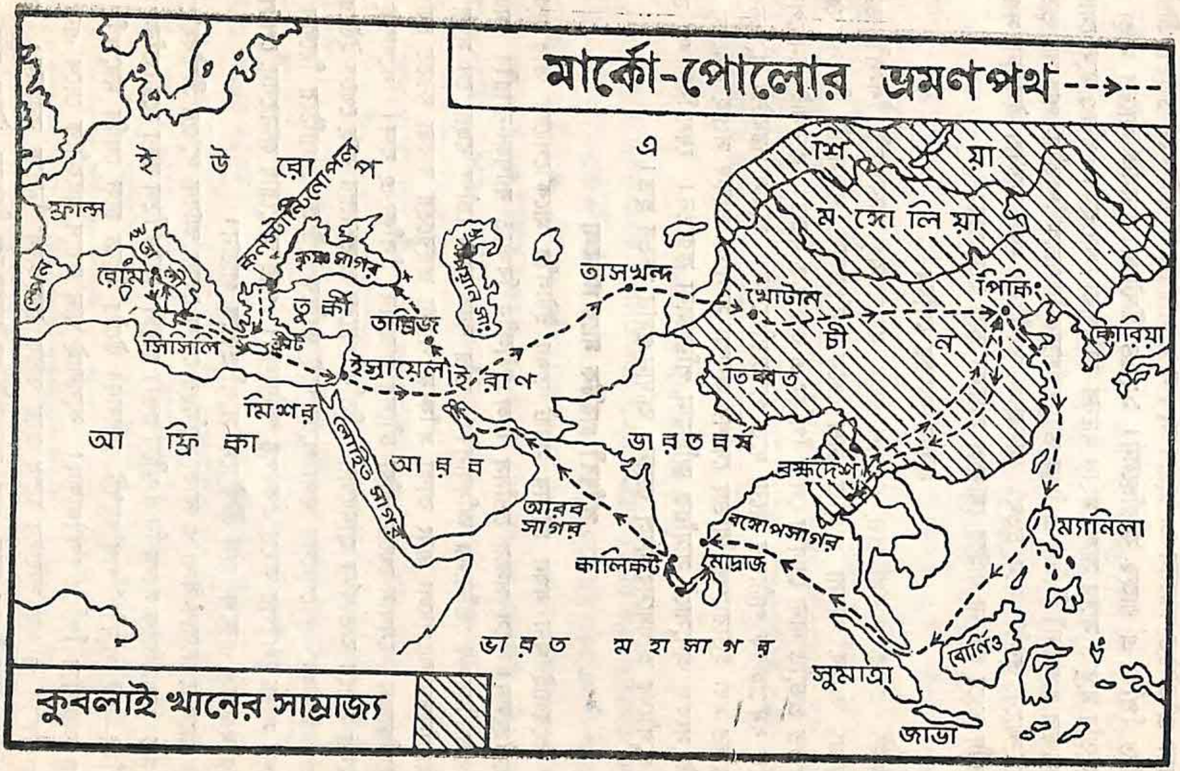
কুবলাই খান

হলাগুর ভ্রাতা কুবলাই খান যখন ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলদের সম্রাট হন, তখন তিনি কারাকোরাম থেকে পিকিং-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পিকিংকে সে



মার্কোপোলো ও কুবলাই খান

সময়ে বলা হত "খানবালিক" অর্থাৎ 'খানদের নগর'। কুবলাই খান চীনদেশটাকে খুব ভালবাসতেন। চীনদেশ নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। এই সময় থেকে চীন-


মার্কো-পোলোর ভ্রমণপথ --->---
কুবলাই খানের সাম্রাজ্য
ইউরোপ
ফ্রান্স
স্পেন
রোম
সিসিলি
ক্রীট
তুর্কী
কৃষ্ণসাগর
কনস্টান্টিনোপল
তাব্রিজ
ইস্রায়েল
ইরাণ
মিশর
আফ্রিকা
আরব
লোহিত সাগর
আরব সাগর
এশিয়া
তাসখন্দ
খোটান
চীন
তিব্বত
মঙ্গোলিয়া
পিকিং
কোরিয়া
ভারতবর্ষ
ব্রহ্মদেশ
বঙ্গোপসাগর
কালিকট
মাদ্রাজ
ভারত মহাসাগর
সুমাত্রা
জাভা
বোর্ণিও
ম্যানিলা

দেশই মোঙ্গলদের শক্তির কেন্দ্রভূমি হল। চীনদেশে কুবলাই খান যে মোঙ্গল বংশকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তা য়ুয়ান বংশ নামে পরিচিত। এই বংশ ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পিকিং-এ রাজত্ব করেছিলেন। ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খানের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহান খানের আধিপত্য শেষ হয়। যদিও মূল মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী পিকিং-এ ছিল তবু রাশিয়ার কিপচকে দ্বিতীয়, পারস্যে, তৃতীয়, তুর্কীস্থানে তুর্কী নামে চতুর্থ, সেলজুক তুর্কীদের শাসনকর্তারা ইলখান সাম্রাজ্য ইত্যাদি নামে চীনের বাইরে মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়।

য়ুয়ান বংশের গৌরব

সাম্রাজ্য, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, জ্ঞানী, সাম্রাজ্য, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী, শিল্প, জ্ঞানী, পণ্ডিত প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক পিকিং-এ যাতায়াত করত। কুবলাই খান পোপের কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠাবার জন্যে দূত পাঠিয়েছিলেন। য়ুয়ান সম্রাটেরা গুপ্তচরদের মারফত মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং সেই সংবাদ অনুসারে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন। দেশ-বিদেশের জ্ঞানী ও গুণীদের আগমনের ফলে জ্ঞানের আদান-প্রদান সম্ভব হত।

পৃথিবী পর্যটক মার্কোপোলো

কুবলাই খান যখন চীনের সম্রাট তখন ইটালীর মার্কোপোলো তাঁর দরবারে গিয়েছিলেন। সে সময়ে ভেনিস ছিল ইটালীর বিখ্যাত বাণিজ্য-নগরী। মার্কো-পোলো ছিলেন ভেনিসের অধিবাসী। তাঁর বয়স যখন চৌদ্দ বছর, সে সময় তাঁর বাবা নিকোলোপোলো এবং কাকা মাফিয়োপোলো জহরতের ব্যবসা করতে বোখারো গিয়েছিলেন সেখান থেকে তাঁরা চীনের রাজধানী পিকিং-এ যান। কুবলাই খান তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি পোলো ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছ থেকে ইউরোপের গল্প, খ্রীষ্টধর্ম ও পোপের কথা শুনে দুই ভাইকে ইউরোপে পাঠিয়ে দিলেন এবং এদের সঙ্গে পোপের কাছে এক পত্র পাঠালেন। পত্রে অনুরোধ জানালেন, পোপ যেন তাঁর দরবারে একশো জন খ্রীষ্টধর্মে সুপণ্ডিতকে পাঠান।

মার্কোপোলোর বাবা ও কাকা দু'বছর দেশে থেকে আবার দু'জন খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক ও মার্কোপোলোকে সঙ্গে নিয়ে চীনে রওনা হলেন। সাড়ে তিন বছর ধরে ভেনিস থেকে পিকিং—এই সুদীর্ঘ পথ হেঁটে চললেন। উটের পিঠে চড়ে গোবি মরুভূমি পার হয়ে অবশেষে পিকিং পৌঁছলেন। কুবলাই খান তরুণ মার্কোকে দেখে এবং তার কথাবার্তায় ও নম্র স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকে রাজকার্যে নিযুক্ত করলেন। মার্কো মোঙ্গল ভাষা শিখে নেন এবং কুবলাই-এর দূতরূপে তিব্বত, উত্তর ব্রহ্ম, দক্ষিণ চীন ও দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি বিদেশে ভ্রমণ করেন।

এভাবে পোলোরা দীর্ঘ ষোল বছর চীনে কাটাবার পর দেশে ফিরবার জন্যে কাতর হয়ে পড়লেন। সে সুযোগও এসে গেল। পারস্যের বিপত্নীক শাসনকর্তার সঙ্গে

চীনের এক মোঙ্গল রাজকুমারীর বিয়ে স্থির হয়। মার্কোপোলো ও তাঁর বাবা, কাকা সেই রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে সুমাত্রা ও ভারত হয়ে পারস্যে আসেন। সেখান থেকে তাঁরা ভেনিসে হাজির হন।

কিন্তু তাঁদের তাতার জাতীয় পোশাক দেখে পরিবারের লোকেরাও পর্যন্ত তাঁদের চিনতে পারলো না। তাঁরা তখন এক ভোজসভার আয়োজন করে সকলের সামনে পোশাক-পরিচ্ছদের সেলাই খুলে ফেললে মূল্যবান হীরে জহরত, মণি-মুক্তো বার হয়ে পড়ল। পোলোদের ভ্রমণকাহিনী শুনে সকলের মনে কিছুটা বিশ্বাস জন্মাল।

এই ঘটনার তিন বছর পরে ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর জেনোয়া ও ভেনিস নামে দুই নগরীর মধ্যে নৌযুদ্ধ বাধে। মার্কোপোলো তখন এক ভেনিস রণতরীর সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধে জেনোয়া জিতে যায় এবং সাত হাজার ভেনিসের লোক বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে মার্কোপোলোও ছিলেন। একঘেয়ে বন্দী-জীবনে সময় কাটাবার জন্যে কারাগারে মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনাতেন। রাস্টিসিয়ানো নামে একজন ইটালীয় তা লিখে নিতেন। এই লিখিত গল্পগুলোই শেষে মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে কুবলাই খান ও সে সময়ের চীনের অবস্থা আমরা জানতে পারি। মার্কোপোলো চীনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মনে হয় চীন একটি শস্যপূর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। পথিকদের জন্যে স্থানে স্থানে সুন্দর পান্থশালা, অসংখ্য বৌদ্ধমঠ, বহুসংখ্যক নগর ও বড় বড় বর্ধিষ্ণু গ্রাম দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। মার্কোপোলোর বিবরণে চীনের দ্রাক্ষালতার বাগান, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, শাকসব্জির উদ্যানের কথা উল্লেখ আছে।

মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খানের রাজধানীর নাম ছিল তাই-দু যা পরবর্তীকালে পিকিং নামে বিখ্যাত হয়। মার্কোপোলোর বর্ণনা অনুসারে পিকিং-এর পরিধি ছিল ২৪ মাইল। নগরটি সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল ; এর মধ্যে বারটা প্রকাণ্ড তোরণ ছিল। সম্রাটের জন্যে সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ ও অস্ত্রাগার ছিল। নগরে সরল রাজপথ ছিল। পথের দু'ধারে পান্থনিবাস, উদ্যান ও দোকানপাট ছিল। চীনের বড় বড় বন্দরগুলোতে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা জাহাজ নিয়ে বাণিজ্য করতে আসত। দক্ষিণ ভারতের বণিকেরা চীনে সওদা করতে যেতেন। চীন থেকে প্রতিদিন এক হাজার গাড়ী বোঝাই রেশমী বস্ত্র দেশ-বিদেশে চালান হত। পিকিং-এ বাণিজ্য-দ্রব্য রাখার জন্যে পাথরের তৈরী গুদাম ঘর ছিল। এখানে অনেক কারিগর বাস করত। সপ্তাহে একদিন তারা বিনা বেতনে সরকারের কাজ করে দিত।

মার্কোপোলো যে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন তার নাম হ্যান চাউ। এই নগর সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। সুবৃহৎ ও মনোরম অট্টালিকাসমূহ, সুসজ্জিত পান্থশালা, প্রাসাদ, বাজার, দোকান-পাট ও পাথরনির্মিত ভান্ডার প্রভৃতি নগরের

ঐশ্বর্যের পরিচয় দিত। এই নগরের রাজপথগুলো পাথর দিয়ে বাঁধান ছিল। নগরের মধ্যে অনেকগুলো খাল ছিল বলে পারাপারের জন্যে বার হাজার সেতু তৈরী হয়েছিল। নগরের লোকেরা রেশমের বস্ত্র ও সোনার অলঙ্কার পরত। সাধারণের স্নানের জন্যে বহুসংখ্যক স্নানাগার ছিল। ভারত ও অন্যান্য দেশের বণিকেরা এখানে অবস্থান করতেন। বড় বড় বাজার বসত, বাজারে পিচফল, মশলা রেশমীবস্ত্র ও সামুদ্রিক মাছ মিলত।

মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে ব্রহ্মদেশ, জাপান, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথার উল্লেখ করেছেন। কুবলাই খান ব্রহ্মদেশ জয় করেছিলেন। তখনকার ব্রহ্মরাজ দু'হাজার বৃহৎ হাতী নিয়ে যুদ্ধ করেন। তবুও ব্রহ্মদেশ মোঙ্গলদের কাছে হেরে যায়। সে সময়ে জাপান ছিল স্বর্ণময় দেশ। রাজা সোনার প্রাসাদে বাস করতেন। কিন্তু তাঁর প্রজারা ব্যবসা-বাণিজ্য জানত না। জাপানের বিরুদ্ধে মোঙ্গল অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কোপোলো বলেছেন যে, সে সময়ে মালাবার উপকূলে প্রচুর গোলমরিচ, মশলা ও ঔষধি গাছ-গাছড়া পাওয়া যেত। দক্ষিণ ভারতের একটি রাজ্য রাণীর দ্বারা নিপুণভাবে শাসিত হত। গুজরাটের হিন্দু যোগীদের সঙ্গে মার্কোপোলোর সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের পরমায়ু দেড়শো বছর। তারা উলঙ্গ অবস্থায় সারা দেহে ভস্ম মেখে থাকত। তারা ষাঁড়কে দেবতা বলে পূজা করত।

মার্কোপোলো কুবলাই খানের সম্পর্কে বলেন যে, রাজার প্রাসাদে বড় বড় ভোজ হত। ভোজের সময় সম্রাট প্রকাণ্ড টেবিলে বসে সপরিবারে ও অতিথিদের নিয়ে ভোজন করতেন। ভোজন-পাত্রগুলো ছিল সবই সোনার। কুবলাই খান গরীব-দুঃখীকে অকাতরে দান করতেন। কোনও ভদ্র পরিবার অভাবে পড়লে সরকার থেকে খোরাক-পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

ঘটনাপঞ্জীঃ

৬২৭ খ্রীঃ—তাই-সুঙের সিংহাসনারোহণ।
৬৩৮ খ্রীঃ—তাই-সুঙ্ কর্তৃক চীনে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন।
৬৩০ খ্রীঃ—হিউয়েন সাঙ্-এর ভারতে আগমন।
৬৪৪ খ্রীঃ—হিউয়েন সাঙ্-এর চীনে প্রত্যাবর্তন।
৮৮১ খ্রীঃ—চীনে রাজ-বিদ্রোহ।
১২৮০ খ্রীঃ—কুবলাই খানের সিংহাসনারোহণ।
১২৯৪ খ্রীঃ—কুবলাই খানের মৃত্যু।
১২৯৮ খ্রীঃ—জেনোয়া ও ভেনিসের মধ্যে নৌ-যুদ্ধ।

জাপান

জাপান ঃ জাপানের অধিবাসীরা তাদের দেশকে বলে নিপ্পন বা উদীয়মান সূর্যোদয়ের দেশ, চীনের অধিবাসীরা এদেশকে বলতো 'জি-পুন'। পাশ্চাত্যের ভ্রমণকারীরা এই 'জি-পুন'-কে করে নিয়েছে জাপান। এরও আগে জাপানের নিজস্ব একটা নাম ছিল—'ইয়ামাতো'। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে চীনের পূর্ব দিকে অর্ধ-চন্দ্রের মত সজ্জিত কয়েকটা দ্বীপ নিয়ে জাপান দেশটি গঠিত।

সমাজব্যবস্থা

জাপান সাম্রাজ্য সামন্ততান্ত্রিক, সমরতান্ত্রিক এবং ক্ল্যান বা গোষ্ঠীভিত্তিতে গঠিত ছিল। মধ্যযুগের শুরু থেকেই জাপান ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত সামন্তপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দামিও বা শক্তিশালী সামন্তদের হাতে রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। সামন্তরা ছিলেন বিভিন্ন ক্ল্যানের লোক। সামন্তদের অসংখ্য যোদ্ধা ছিল। যোদ্ধারা ছিল বেতনভোগী। পরাক্রান্ত জমিদার যোদ্ধাদের সাহায্যে জমিদারী রক্ষা ও নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতেন। দেশের সম্রাট সামন্ত-দের নির্দেশ ও পরামর্শ মত কাজ করতেন।

ইউরোপের মত জাপানের জমিদাররা ম্যানরে বাস করতেন। এদের ম্যানরকে 'শো" বা শোয়েন বলা হত। দামিওর প্রচুর সম্পত্তি থাকত। ম্যানরে যে সব কৃষক বাস করত, তারাই দামিওর জমি চাষ করতেন। এই সব জমির জন্য দামিও রাজাকে কোন কর দিত না। রাজধানী থেকে দূরে গঠিত জমিদারীতে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। সমাজে জমিদারের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল।

জাপানের লিখিত ইতিহাস ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। সেই সময় থেকেই চীন ও কোরিয়ার ঐতিহাসিক বিবরণে জাপানের সমাজ-বিবর্তনের কথা উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের প্রথম দিকে চীন পর্যটকেরা জাপানকে উন্নত দেশরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, জাপানে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য ছিল। তারা প্রাধান্য লাভের জন্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো। তাদের বিবরণে জাপানে নারী-শাসনের কথাও উল্লেখ আছে। জাপানে যে শিন্টোমত প্রচলিত ছিল, সেই ধর্মমতের আলোকে জাপানীদের জীবনে ধর্মমতের প্রভাব, উন্নত সভ্যতা গ্রহণের এবং মার্জিত সংস্কৃতি প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।

চীনের সংস্পর্শে আসবার পূর্বে "কোজিকি" এবং "নিহোনশোকি" ইতিবৃত্ত থেকে মধ্যযুগের জাপানের সামাজিক অবস্থার কথা জানা যায়। ইতিবৃত্ত দুটো অষ্টম শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সামন্তপ্রথা প্রচলিত হয়। সামন্তযুগে জাপানী সমাজ চার সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল—সামরিক ও শাসকশ্রেণী, কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী। জাপানী সমাজ পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত ছিল। গোষ্ঠীকে বলা হত "উজি"। গোষ্ঠীগুলো একই পূর্বপুরুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করে নায়ক থাকত এবং প্রত্যেকে পারিবারিক দেবতার

পূজা করত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর সঙ্গে কতকগুলো গৃহস্থালীর কাজ নির্ধারিত ছিল। এই সব কর্মীরা বিশেষ কাজের ভিত্তিতে গিল্ড্ তৈরী করত। কৃষিকার্য, তাঁত বোনা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করা, সামরিক কার্য করা বা ধর্মমূলক কার্য করা—এইসব কাজে কর্মীদের গিল্ড্ ছিল। এই পদ্ধতিতে পদমর্যাদার ভিত্তিতে জনসাধারণকে দুভাগে বিভক্ত করা হত,—একদল ছিল স্বাধীন লোক যারা গোষ্ঠীর সদস্যভুক্ত ছিল, আর একদল হল যাদের পারিবারিক কোন নাম ছিল না এবং যারা নিজস্ব বৃত্তিকর্মে নিযুক্ত ছিল।

মিকাডোর ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব

জাপানের সম্রাটকে মিকাডো বলা হত। মধ্যযুগে জাপানে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। চীন বা অন্যান্য দেশের মত জাপানের সম্রাট বা মিকাডো স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তিনি কিয়োটো নগরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করতেন, মিকাডো নিজেকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে মনে করতেন। তিনি নিজের ক্ষমতা অর্ধ-স্বর্গীয় বলে ঘোষণা করতেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের ও জনগণের ঐক্যের প্রতীক। তিনি শাসনক্ষমতা জনগণের আনুগত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রজাদের অশেষ ভক্তিভাজন হলেও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না। তিনি নামেমাত্র শাসক ছিলেন। প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা ছিল 'শোগানের' হাতে। তিনি মিকাডো নামেই প্রজাদের কাছে পরিচিত ছিলেন। প্রজারা কোনদিন সম্রাটের নাম পর্যন্ত জানতে পারেনি। এমনকি তারা চোখেও মিকাডোকে কোনদিন দেখেনি। তিনি কিয়োটো শহরে অবহেলিত অবস্থায় থাকতেন। তিনি যখন পথ দিয়ে হাঁটতেন, কোন উঁচুস্থান থেকে তাঁকে দেখতে কাউকে দেওয়া হত না। যখন রাজকীয় মিছিল বা শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করত, তখন উচ্চতল বাড়ীর ছাদে কাউকে থাকতে দেওয়া হত না। প্রজারাও সম্রাটকে শ্রদ্ধা করত। সম্রাটের জন্য প্রজারা যুদ্ধক্ষেত্রে গর্বের সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিত। কারণ তাদের বিশ্বাস আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই পূর্বপুরুষগণের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। প্রজারা বিশ্বাস করত, সম্রাটের জন্যে তারা শান্তিতে আছে।

শিণ্টোমত ও মিকাডো

'শিণ্টো' শব্দের অর্থ 'ঈশ্বরের পথ'। জাপানীদের অধিকাংশ শিণ্টোমতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রচলিত অর্থে একে 'ধর্ম' বলে অভিহিত করা চলে না। সাধারণতঃ রাজ-বংশীয় পূর্বপুরুষ ও পারিবারিক পূর্বপুরুষদের অর্চনার মধ্যেই শিণ্টোবাদ সীমাবদ্ধ। এই ধর্মে ধর্মাচরণের সঙ্গে দেশপ্রেমের শিক্ষা দেওয়া হত। এই কারণে ধর্মের সঙ্গে দেশাত্মবোধ জাপানীদের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। জাপানে তিন প্রকারের ধর্মমত প্রচলিত ছিল—কনফুসিবাদ, শিণ্টোমত ও বৌদ্ধধর্ম। কনফুসিবাদ থেকে শিণ্টোমত উৎপন্ন হয়েছিল। জাপানীরা আবার বুদ্ধদেবকে প্রভু শিণ্টোর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিল। সাধারণ কৃষকেরা কোনটাই বুঝতে না পেরে তিন ধর্মের মিশ্রণে বিশ্বাস করত। তারা প্রাকৃতিক দেবতা ও পূর্বপুরুষদের পূজাও এই

অনুশীলনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলত। জাপানীরা শিণ্টোর প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছিল। এরা শিণ্টো মতবাদে বিবাহ অনুষ্ঠান করেন আবার বৌদ্ধধর্ম অনুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচার অনুষ্ঠান করেন।

জনসাধারণ প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করত। চাঁদ, সূর্য, ঝড়, পাহাড়, মেঘ, নদী, গাছ, এমনকি ফুলও জাপানীদের দেবতা ছিল। তাদের দেবতাদের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা ভয় বেশী ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করত। এই প্রাচীন ধর্মবোধ থেকেই তাদের সংগঠিত শিণ্টোমত গড়ে ওঠে। শিণ্টো ধর্মমত খুব সহজ ও সরল ছিল। এই মতবাদ অনুসারে জাপানীরা ফসলের জন্যে, রোগ ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্রাকৃতিক শক্তির পূজা ও প্রার্থনা করত এবং অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাত। জাপানীদের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্য। পরবর্তীকালে সূর্যকে তারা দেবীরূপে পূজা করে। সূর্যদেবীকে জাপানীরা 'আমাতেরাষু' বলত। সূর্যকে দেবীত্বে আরোপ করার পিছনে ধর্মনৈতিক অপেক্ষা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রধান ছিল।

মিকাডো নিজেকে দেবী সূর্যের বংশধর এবং দৈবপ্রভাবে জাপানে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে বিশ্বাস করতেন। জনগণও মিকাডোর এই বিশ্বাসকে মেনে নিত। শিণ্টোমতের এইরূপ বিশ্বাস এবং প্রচলিত কাহিনীর ভিত্তিতে জাপানের শাসকগোষ্ঠী মিকাডোকে কেবলমাত্র জাতীয় নেতারূপেই নয়, ঈশ্বরের অর্ধ-প্রতিনিধিরূপে সম্মানিত করতেন। সম্রাট হলেন পৃথিবীতে জাতীয় দেবতার অর্ধ-প্রতিনিধি। এই বিশ্বাসের বলে মিকাডো নিজেকে শিণ্টোমতের সর্বোচ্চ পুরোহিত বলে প্রচার করতেন। ধর্মসংক্রান্ত যে কোন নির্দেশ তিনি দিতেন, জনগণ বিনা বিচারে তা মেনে নিত। রাজশক্তি ও প্রধান পুরোহিতের উভয়বিধ ক্ষমতা মিকাডোর হাতে ন্যস্ত হওয়ায় তিনি জাপানে কেন্দ্রীয় শাসন-ক্ষমতায় নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনগণের জাতীয় আনুগত্য দাবী করেন।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও ইহার প্রভাব

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এইরূপ ছিল জাপানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা। এই সময়ের মধ্যে চীনের শিক্ষার প্রভাবে জাপানীরা কিছুটা সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে চীন ও কোরিয়ার মধ্য দিয়ে ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে। ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম জাপানে দৃঢ়ভাবে প্রচলিত হয়। তখন থেকেই বৌদ্ধধর্ম জাপানের প্রধান ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে শুধু বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়, চীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব জাপানের উপর পড়ে। এমনকি সরকার গঠন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে জাপানের শাসকবর্গ তাদের সরকার গঠন করেন। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে কোরিয়া ও চীন থেকে সন্ন্যাসী, শিল্পী, পণ্ডিত ও কারিগর জাপানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। তখন থেকেই জাপানীরা যে নতুন চীনা পদ্ধতি ও রীতি-নীতির জ্ঞান লাভ করে তা নিজেদের আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করতে থাকে। এই

ব্যাপারে প্রধান ছিলেন জাপানের গোঁড়া বৌদ্ধরাজ শোতোকু। গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জটিলতা থেকে তিনি কেন্দ্রীভূত জাপান রাষ্ট্র গঠন করতে চাচ্ছিলেন। তিনি ঐরূপ রাষ্ট্রের ভিত্তি বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের মধ্য দিয়েই প্রসার ঘটাতে পেরেছিলেন। তিনি ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে শাসকশ্রেণীর উদ্দেশ্যে কতকগুলো আইন জারি করলেন। এর মধ্যে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও কন্‌ফুসিবাদ থেকে কতকগুলো নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করেন যার দ্বারা রাজার ক্ষমতা এবং জনগণের অধিকার ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেন। জাপানে তখন একটা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল এবং অনেকগুলো গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান বা রাজগোষ্ঠীর প্রধান যাজকের পদলাভ সহজসাধ্য ছিল না। ৬২১ খ্রীষ্টাব্দে শোতোকুর মৃত্যুর পর চীনে যে দূত পাঠানো হয়েছিল, তারা জাপানে ফিরে এলেন এবং চীনের তাঙ্ বংশের অধীনে দক্ষ সরকার ও চীনের উন্নত জীবনযাত্রার কথা প্রকাশ করলেন। এর ফলে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'তাইকোয়া' বা মহান সংস্কার রাজাজ্ঞায় ঘোষিত হল। চীনের ধারা অনুসারে জাপানের নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। জমির রাজস্ব ও কর-ব্যবস্থা সংশোধিত ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হল এবং তাঙ্ বংশের মত কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হল। এতে সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলেন সম্রাট।

কিন্তু ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে নারাতে নতুন রাজধানী স্থাপন করে রাজশক্তি আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় এবং শাসন-ব্যবস্থার উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করলেন। সম্রাট বৌদ্ধ ভজনালয়গুলোর ক্ষমতাবৃদ্ধির পৃষ্ঠপোষকতা করলেন। জাপানে অনেক বৌদ্ধমঠ ও বিহার নির্মিত হল। কিন্তু শুধুমাত্র মর্যাদা নিয়ে নয়, বৌদ্ধ-ভজনালয়ের সুবিধা ও অধিকার নিয়ে রাজার সঙ্গে বৌদ্ধ-ভজনালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধল।

ইতিমধ্যে জাপানে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও শাসন-ব্যবস্থায় দক্ষ সরকারী কর্মচারী তৈরী হয়ে ওঠার ফলে জাপান ধীরে ধীরে আপন পায়ে ভর দিতে শুরু করল। ফলে জাপানীদের চরিত্র ও ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণে জাপানে নতুন সভ্যতার বিকাশ ঘটতে আরম্ভ হল। চীনের অনুকরণে জাপানে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন নতুন করে গড়ে উঠল। কারণ জাপানের তখনো নিজস্ব কোন লিপিমালা ছিল না, জাপানে চীনালিপি গৃহীত হয় এবং এই লিপির মাধ্যমেই জাপান ভেষজ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা, পঞ্জিকা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের গূঢ় বিষয়াদি শিক্ষালাভ করে এবং কন্‌ফুসীয় ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। জাপানের রাজপ্রাসাদ, মন্দিরগুলো চীনের শিল্প-রীতিতে গড়ে উঠল। রাজকর্মচারী ও সভাসদেরা রাজকাজে সরকারী ভাষা ব্যবহার করতে লাগল। চীনের পোষাক, রাজসভার আদব-কায়দা, তাদের পদ ও পদবী চীন থেকে ধার করা হল। কিন্তু ভেতরে জাপানের প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কার ও অভ্যাসগুলো বস্তুতঃ অপরিবর্তিত রইল এবং গ্রামাঞ্চলে পুরাতন কৃষিপদ্ধতি ও সনাতন দেবতার পূজা পূর্বের মত রইল। তবুও একথা বলা যায় যে, চীন থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের ফলে জাপানীরা শুধু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞানই লাভ করল না, অট্টালিকা নির্মাণ, খোদাই-কাজ, তাঁতবোনা, ধাতুশিল্প প্রভৃতি ব্যাপারে জাপান যথেষ্ট অগ্রগতির পথে পদক্ষেপ করল। নারাতে রাজধানী পরিবর্তনের পরবর্তী ৪০০ বছর

কালকে যদি চীনপ্রভাব বিস্তার ও আত্মস্থ করার কাল বলা হয়, তবে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালকে চীন-প্রভাবে মিলন ও সংস্কারের যুগ বলা যেতে পারে।

৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনের তাঙ্ রাজত্বে মিচিজেনী নামে এক কূটনৈতিক মিশন পাঠাবার প্রস্তাব এসেছিল। তখন সুগাওয়ারা মিচিজেনী নামে এক চীন পণ্ডিত চীনে দূত বিনিময় বন্ধ করার জন্যে সম্রাটের কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয় এবং তখন থেকেই চীনের রাজ-সরকারের সঙ্গে জাপানের সরকারী সংযোগ বন্ধ হয়। যেটুকু যোগাযোগ ছিল, তা বেসরকারী।

বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারগুলির বাধাদান

পরবর্তীকালের জাপানের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল, বৃহৎ গোষ্ঠী বা পরিবারগুলো কিভাবে ক্রমশই রাজার নামে ক্ষমতা অধিকার করেছিল। সম্রাট নামেমাত্র শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু প্রধান গোষ্ঠীগুলো, যেমন ফুজিয়ারা গোষ্ঠী, রাজপরিবারে বিয়ে করে ক্রমশই ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টায় ছিল এবং নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে নিজেদের জাপানের প্রধান শাসনকর্তারূপে প্রতিপন্ন করল। কিন্তু চীনের অনুকরণে শাসন-ব্যবস্থা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল। তাই তারা প্রচণ্ড বাধাদান করেছিল। বড় বড় দামিওরা দীর্ঘকাল ধরে নতুন আইন বা বিধিকে রহিত করার চেষ্টা করেছিল। এদের বাধাদানে জাপানের ভূমি-রাজস্ব ও কর-ব্যবস্থা নবম ও দশম শতাব্দীতে ভেঙে পড়ে। দামিওরা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অধীনে ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত আইনকে অমান্য করত। মধ্য জাপানে বৃহৎ পরিবারগুলোর দ্বারা শাসকগোষ্ঠী বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল।

তাই ফুজিয়ারা-পরিবার মিকাডোর মুখপাত্র হিসেবে জাপানে উত্তরাধিকারসূত্রে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। সরকারের সকল বিভাগ এই পরিবারের হস্তগত হল এবং নিজেরা ধন-সম্পত্তি লাভে সচেষ্ট হল। সম্রাটও শাসন-ব্যাপারে ফুজিয়ারা-পরিবারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে সম্রাটের সিংহাসন লাভ ও পদচ্যুতি এই পরিবারের ইচ্ছার অধীন ছিল। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ফুজিয়ারা পরিবারের পূর্ণ প্রতিপত্তি ছিল। পরবর্তীকালে অন্য গোষ্ঠীরা ফুজিয়ারা পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তবুও ফুজিয়ারা-পরিবার আরো এক শতাব্দীকাল প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর আত্মকলহের সুযোগে টিকেছিল। এই ফুজিয়ারা-পরিবারের আমলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং প্রদেশগুলো সেই সময়ে সামরিক পরিবাররূপে গড়ে উঠেছিল। পূর্ব ও উত্তর জাপানের সামন্তরা রাজধানী থেকে দূরে সীমান্ত অঞ্চলে নিজেদের পরিবারগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়দের দিয়ে সামন্তগোষ্ঠী তৈরী করতে থাকে। এরা শাসন-ক্ষমতা দখলের জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। এইরূপ সামরিক পরিবারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাইরা ও মিনামোতো পরিবার। ফলে পরিবারগুলোর মধ্যে সংগ্রাম

বাধল। তাইরা-নেতা ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মিনামোতো-পরিবার জাপানের অন্তঃসমুদ্রে অনুষ্ঠিত দান্নোর র নৌযুদ্ধে তাইরা পরিবারকে পরাজিত করে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায়। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে তাইরা গোষ্ঠীর পরাজয় এবং ফুজিয়ারা-পরিবারের ক্ষমতা হ্রাসের ফলে মিনামোতো পরিবার জাপানের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে। তাদের নেতা ইয়ারিতোমো পূর্ব জাপানের কামাকুয়াতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেকে জাপানের সম্রাট মনে করলেন, কিন্তু সমস্ত সামরিক পরিবারের সেনানায়করূপে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। মিকাডো তখন ইয়ারিতোমোর সামরিক বাহিনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। ইয়ারিতোমো সামন্ত পরিবার ও সামরিক পরিবারগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ়তর করলেন এবং রাজকরমুক্ত জমিদারী গঠন করলেন। তার নাম 'ম্যানর' বা 'সোয়েন'। ফুজিয়ারা, তাইরা, মিনামোতো পরিবারগুলো বিনা করে জমিদারী ভোগ করতে লাগল। সরকারী কর্মচারীরাও দূরে দূরে ছোট ছোট জমিদারী স্থাপন করে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা চালু করলেন।

কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতা

ফুজিয়ারা, তাইরা এবং মিনামোতো প্রভৃতি প্রাচীন শক্তিশালী পরিবারগুলোর ক্ষমতালাভ করার ফলে সম্রাটের ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে পড়ে। এরা কেন্দ্রীয় শাসনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হওয়ার ফলে বৌদ্ধ-ভজনালয়গুলোর শৃঙ্খলা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করার ফলে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

শোগন

শোগন শব্দের অর্থ 'প্রধান সেনাপতি'। শোগন 'ইয়েড্ডো' অর্থাৎ টোকিওতে বাস করতেন। জমিদারদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান গোষ্ঠীর (তোকুগাওয়া) নায়ক শোগনের পদ অধিকার করতেন। তিনিই ছিলেন রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা। মিকাডোর প্রতিনিধিরূপে শাসনসংক্রান্ত সব কাজ শোগন পরিচালনা করতেন। তবে অন্যান্য গোষ্ঠীর হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শোগন স্বেচ্ছাচারী হতে পারেননি।

সামুরাই

জমিদারের অসংখ্য অনুচর নিয়ে যে যোদ্ধাশ্রেণী গঠিত হত তাদের 'সামুরাই' বলা হয়। এরা সামন্তদের অধীন ও অনুগত ছিল। এরা ছিল মধ্যযুগে ইউরোপের নাইটদের মত। সাহস, আত্মদান ও আনুগত্য এদের ধর্ম ছিল। এরা ছিল জমিদারদের (দামিও) বেতনভোগী যোদ্ধা। এদের সাহায্য নিয়ে জমিদাররা নিজেদের জমিদারী রক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতেন। জাপানের সামরিক ব্যবস্থায় সামুরাইদের সামরিক মর্যাদা ও অধিকার যথেষ্ট ছিল। জমিদার বা অভিজাতবর্গের পথপরিক্রমাকালে

সাধারণ মানুষ নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানাত। সামান্যতম অশ্রদ্ধার চিহ্ন দেখা গেলে সামুরাইরা বেত্রাঘাত করে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাত।

বুশিদো

'বুশিদো' কথার অর্থ হল বীরধর্ম। এটা ইউরোপের 'শিভ্যালরি'-র মত। বুশিদো হল জাপানের সম্মানসূচক কঠোর বিধি। এই সম্মান লাভের বিনিময়ে



সামুরাই

সামুরাইরা আনুগত্য ও আত্মত্যাগের শপথ গ্রহণ করত। জাপানে দীর্ঘকাল ধরে আত্মকলহের ফলে সামরিক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক কর্তব্যপরায়ণতা, আন্তরিক অনুভূতি গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই অনুভূতি কতকগুলো রীতি বিধিবদ্ধ করল। এর মূল কথা হল আনুগত্য, প্রভুর সেবায় আত্মোৎসর্গ। এইভাবে জাপানে গড়ে ওঠে বুশিদো। যুদ্ধের সময় অশ্ব ও ধনুক নিয়ে সামুরাইদের প্রভুকে সাহায্য করতে হবে। প্রভুরা যোদ্ধাদের কাছ থেকে এইরূপ দাবী করল। এই রীতিগুলোকে 'শিভ্যালরি' বা জাপানী ভাষায় 'বুশিদো' বলা হয়। যদিও জমিদারগণ বুশিদোদের গোষ্ঠীতন্ত্রের স্বার্থে ব্যবহার করতেন, তবুও এরা জাপানী

সামরিক বাহিনীর মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা ও আত্মত্যাগের শিক্ষা দান করেছিল। এই সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে ইয়ারিতোমা, তায়রা প্রভৃতি গোষ্ঠীর কাছ থেকে অধিকৃত জমি উদ্ধার করে জমিদারগণ সামুরাইদের মধ্যে বিতরণের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

ঘটনাপঞ্জী ঃ

৪০০ খ্রীঃ—জাপানের লিখিত ইতিহাসের সূত্রপাত।
৫৭৫ খ্রীঃ—জাপানে বৌদ্ধধর্মের দৃঢ় প্রচলন।
৬০৪ খ্রীঃ—শোতোকুর আইন জারি।
৬৪৫ খ্রীঃ—মহান সংস্কারের ঘোষণা ও সামন্তপ্রথার প্রবর্তন।
৭১০ খ্রীঃ—নারাতে নতুন রাজধানী স্থাপন।
৮৯৪ খ্রীঃ—চীন ও জাপানের মধ্যে সরকারী সংযোগ বন্ধ।
১১৮৫ খ্রীঃ—দান্নোরার নৌযুদ্ধ।

অনুশীলনী

চীন

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। তাঙ্ বংশের শাসনকাল কতদিন ছিল?
২। তাঙ্ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন?
৩। তাই-সুঙের সমসাময়িক ভারতীয় সম্রাট কে ছিলেন?
৪। "সিঙ্ হোয়াং" আখ্যার অর্থ কি?
৫। তাঙ্ বংশের শ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন?
৬। হিউয়েন সাঙ্ কে ছিলেন?
৭। হিউয়েন সাঙ্ কার রাজত্বকালে ভারতে আসেন?
৮। তুর্কীদের রাজাকে কি বলা হত?
৯। হিউয়েন সাঙ্ কতকাল ভারতে অবস্থান করেছিলেন?
১০। সুঙ্ বংশের আমলে চীনের রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়েছিল?
১১। সুঙ্ বংশের আমলের কৃষকদের কি ঋণ দেওয়া হত?
১২। তুঙ্ য়ুয়ানের বিখ্যাত চিত্র কি?
১৩। মোঙ্গলরা কি কি নামে পরিচিত?
১৪। "পিকিং"-এর অর্থ কি?
১৫। মোঙ্গলদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন?
১৬। কুবলাই খানের মৃত্যু কত খ্রীষ্টাব্দে ঘটে?
১৭। মার্কো পোলো কে ছিল?
১৮। পিকিং-এর পূর্ব নাম কি ছিল?

১৯। মার্কো পোলো কোন্ দেশের শাসনকর্তা ছিলেন?

২০। কোন্ দেশকে "স্বর্ণময় দেশ" বলা হত?

২১। য়ুয়ান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে?

২২। কোন্ দেশকে "উদীয়মান সূর্যের" দেশ বলা হয়?

সংক্ষিপ্ত-উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। তাই-সুঙের রাজ্যজয় বর্ণনা কর।

২। লি-পো কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান বল।

৩। তাই-সুঙ্-এর ধর্মীয় উদারতার পরিচয় দাও।

৪। তাঙ্ যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান?

৫। "সুঙ্ যুগ চীনের ইতিহাসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যে প্রসিদ্ধ"। আলোচনা কর।

৬। সম্রাট শেন-সুঙের অর্থনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। সুঙ্ যুগের চিত্রকলার পরিচয় দাও।

৮। চিত্রগুলো কিসের উপর আঁকা হত?

৯। মোঙ্গলদের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান?

১০। মার্কো পোলোর বাল্য-জীবন কিরূপ ছিল?

১১। হ্যান চাউ নগরের বিবরণ দাও।

১২। মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে কুবলাই খানের সম্বন্ধে কি জানা যায়?

১৩। চীনের রাজধানী পিকিং-এর বর্ণনা দাও।

১৪। মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কিভাবে লেখেন?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। তাই-সুঙ্কে তাঙ্ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?

২। চীনের ইতিহাসে তাঙ্ যুগকে "সুবর্ণ যুগ" বলা হয় কেন?

৩। হিউয়েন সাঙ্-এর ভারতে আগমন এবং ভারত থেকে চীনে প্রত্যাগমনের বিবরণ দাও।

৪। কুবলাই খান কে ছিলেন? তাঁর রাজত্বকালে চীনের গৌরব বর্ণনা কর।

৫। মার্কো পোলোর চীনে আগমন ও চীন থেকে ইটালীতে প্রত্যাবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে চীন, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের কথা কি জানা যায় লিখ।

জাপান

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শোয়েন কাকে বলা হত?

২। কত খ্রীষ্টাব্দ থেকে জাপানের লিখিত ইতিহাস শুরু হয়?

৩। জাপানের মধ্যযুগের সামাজিক অবস্থার কথা কোন্ কোন্ গ্রন্থ থেকে জানা যায়?

৪। 'উজি' কাকে বলা হয়?

৫। মিকাডো কাকে বলা হত?

৬। মিকাডো নিজেকে কি মনে করতেন?
৭। 'শিণ্টো' শব্দের অর্থ কি?
৮। জাপানে কোন্ ধর্মমত প্রধান ছিল?
৯। জাপানের প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা কার হাতে থাকত?
১০। আমাতেরাষু কে ছিলেন?
১১। শোতাকু কে ছিলেন?
১২। কোন্ দেশ থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল?
১৩। মিচিজেনী কে ছিলেন?
১৪। কাদের দামিও বলা হত?
১৫। জাপানে কোন্ কোন্ পরিবার শক্তিশালী ছিল?
১৬। 'শোগন' শব্দের অর্থ কি?
১৭। 'নিপ্পন' শব্দের অর্থ কি?
১৮। কাদের 'সামুরাই' বলা হত?
১৯। জাপানের "শিভ্যালরি"-কে কি বলা হত?
২০। টোকিওর জাপানী নাম কি?
২১। কত খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সামন্তপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন:

১। মধ্যযুগে জাপানের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?
২। গিল্ড্ কি করে গড়ে ওঠে? এদের কাজ কি ছিল?
৩। জাপানে শিণ্টোমত সম্বন্ধে কি জান লিখ।
৪। জাপানীরা কি কারণে সূর্যকে দেবীরূপে পূজা করেন?
৫। মিকাডো কিভাবে শিণ্টোমতকে কেন্দ্র করে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করেন?
৬। কত খ্রীষ্টাব্দে জাপানে "তাইকোয়া" ঘোষিত হয়েছিল? এর ফল কি হয়েছিল?
৭। জাপান কিভাবে চীনপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়?
৮। 'দামিও' ও 'শোগন' সম্বন্ধে টীকা লিখ।
৯। কোন্ কোন্ গুণ বুশিদোর অন্তর্গত ছিল?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন:

১। মিকাডোর ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।
২। জাপানের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩। চীনের সংস্পর্শে এসে জাপানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে কি পরিবর্তন ঘটেছিল?
৪। ফুজিয়ারা, মিনামোতো ও তায়রা গোষ্ঠির মধ্যে ক্ষমতা লাভের জন্যে যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল, তার বিবরণ দাও।
৫। সামুরাইদের কাজ কি ছিল? তারা কিভাবে বুশিদোদের অনুসরণ করত?

মধ্যযুগে ভারত

(ক) গুপ্তযুগের পতন

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গুপ্তরাজগণের অধীনে এক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ সুবর্ণযুগ রূপে খ্যাত। বহুবিধ আভ্যন্তরীণ কারণে এই গৌরবময় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছিল। কিন্তু দুর্বল গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে যে সব রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল তাদের মধ্যে মৌখরীগণের অধীনে কনৌজ, শশাঙ্কের অধীনে গৌড়, এবং চালুক্যগণের অধীনে বাদামী বা বাতাপী রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে গুপ্ত সাম্রজ্যের পতন ও স্বাধীন রাজ্যগুলো গড়ে ওঠার মূলে বৈদেশিক হূণ আক্রমণ বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

হূণ আক্রমণ

৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে হূণ-নায়ক এটিলার নেতৃত্বে যখন রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হচ্ছিল সে সময় তাদের একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করেছিল। এই শাখা শ্বেতহূণ নামে পরিচিত। হূণরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল আক্রমণ করলে গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট স্কন্দগুপ্ত তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করেন। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত হূণদের পরাজিত করলেও তারা ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়নি। তারা ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য ও কাবুল জয় করে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং হূণরাজ তোরমাণের নেতৃত্বে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তোরমাণের সাম্রাজ্য মালব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মালবে প্রাপ্ত এক লিপি থেকে জানা যায় গুপ্তরাজ ভানুগুপ্তের সঙ্গে মালবে একটা ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। প্রায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত—পাঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজপুতানা ও মালব তোরমাণের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তোরমাণের পুত্র মিহিরকুল (মতান্তরে মিহিরগুল) পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বর্বর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির নেতা ছিলেন। তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মান্দাশোরের রাজা যশোবর্মন এবং গুপ্তরাজ নরসিংহ বলাদিত্যের কাছে হেরে যান। মিহিরকুল বহু বৌদ্ধ বিহার স্তূপ ধ্বংস করেছিলেন। মিহিরকুল যশোবর্মনের নিকট পরাজিত হন। বলাদিত্য তাকে পরাজিত করে বন্দী করেন। পরে বলাদিত্য তাঁকে মুক্তি দিলে মিহিরকুল কাশ্মীরে গিয়ে আশ্রয় লন এবং কথিত আছে সেখানে কাশ্মীর-রাজাকে পরাজিত করে কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন। মিহিরকুলের পরেও প্রায় শতাব্দীকাল হূণগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করেছিলেন।

হূণ আক্রমণের গুরুত্ব

বার বার হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। পাঞ্জাব ও মধ্যভারতে হূণ আধিপত্য স্থাপিত হল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক

শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। হূণ দলপতিরাও ছোট ছোট রাজ্যে রাজত্ব করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে বিয়ে করে হিন্দু সমাজে মিশে যায়। তারা ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করল। রাজপুত জাতির মধ্যে হূণ-রক্ত আছে। রাজপুতরাও কালক্রমে খুবই শক্তিশালী হয়েছিল। সুতরাং পঞ্চম শতকের হূণ আক্রমণের প্রভাব সাংস্কৃতিক জীবন অপেক্ষা সমাজ-জীবনেই বেশী। বর্তমানে মধ্যভারত ও পাঞ্জাবে বংশ-পদবী এবং গ্রামের নামকরণে ঐ প্রভাব সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষকে এক দুর্ধর্ষ জাতি উপহার দেওয়া ছাড়া হূণেরা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনকালে স্বাধীনরাজ্য

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের অক্লান্ত চেষ্টায় যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তা আভ্যন্তরীণ কলহ ও বৈদেশিক আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী দুর্বল রাজগণের আবির্ভাব, আত্মকলহ, সামরিক দুর্বলতা, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সামন্তরাজগণের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই সময় দুর্ধর্ষ হূণ জাতির বার বার আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। এই সময় উত্তর ভারতে কয়েকটা রাজবংশ ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করে সমগ্র আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর প্রাদেশিক রাজ্যগুলো স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকে। এই প্রাদেশিক শক্তিগুলোর মধ্যে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি, কনৌজের মৌখরী, মালবের গুপ্ত এবং কামরূপের বর্মন-বংশীয় রাজগণ, সৌরাষ্ট্রে বলভীরাজবংশ শক্তিশালী হয়ে উঠেন। অন্যদিকে গৌড়েও শশাঙ্কের অধীনে শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে। তখনকার ঐ প্রাদেশিক শক্তিগুলোর মধ্যে কনৌজের মৌখরী-বংশ এবং থানেশ্বরের পুষ্যভূতি-বংশ ছিল অন্যতম।

হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের একশো বছর পরে উত্তর ভারতের থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশের উদ্ভব ঘটে। পুষ্যভূতি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রভাকর বর্ধন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হন। প্রভাকর বর্ধন তাঁর কন্যা রাজ্যশ্রীকে কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু মালবরাজ দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করে গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। রাজ্যবর্ধন এই দুঃসংবাদ পেয়ে বন্দিনী ভগিনীকে উদ্ধার ও মালবরাজকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যুদ্ধে তিনি দেবগুপ্তকে পরাজিত করলেন বটে, কিন্তু নিজে দেবগুপ্তের বন্ধু গৌড়রাজ শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হলেন। ইতিমধ্যে কনৌজের কারাগার থেকে বন্দিনী রাজ্যশ্রী কোন রকমে উদ্ধার পেয়ে বিন্ধ্যারণ্যে পালিয়ে গেলেন। একই সময়ে থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসন শূন্য হলে মন্ত্রী ও প্রধানরা পরামর্শ করে ৬০৬

খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধনকে উভয়রাজ্যের রাজা করলেন। ঐ বছর থেকে হর্ষাব্দ গণনা করা হয়।

হর্ষবর্ধন রাজা হয়েই রাজ্যশ্রীর সন্ধানে বার হলেন। তিনি বিন্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলেন রাজ্যশ্রী অগ্নিকুণ্ড জেবলে আত্মহত্যার আয়োজন করছেন। হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীকে



হর্ষবর্ধন

নিরস্ত করে কনৌজে তাঁকে নিয়ে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি কনৌজের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। থানেশ্বর থেকে কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। তিনি "শিলাদিত্য" উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যবিস্তার

হর্ষবর্ধন গৌড়ের পার্শ্ববর্তী রাজ্য কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে উভয়ে ভাইয়ের হত্যাকারী গৌড়রাজ শশাঙ্ককে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে শশাঙ্ক হেরে গেলেও হর্ষবর্ধন তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত গৌড় অধিকার করতে পারেন নি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি মগধ দখল করেন। তিনি উত্তর বঙ্গে অভিযান করেন। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গঞ্জাম জেলার কঙ্গোদ জয় করে পশ্চিম ভারতের বলভী রাজ্যের রাজা ধ্রুবসেনকে পরাজিত করেন। পূর্ব মালবের রাজা মাধবগুপ্ত হর্ষবর্ধনের বশ্যতা স্বীকার করেন। এরূপে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মাদা নদী এবং পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য তিনি দক্ষিণ ভারতেও অভিযান করেন। কিন্তু বাতাপীর চালুক্যবংশীয় শক্তিশালী রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাত্য জয়ের আশা ত্যাগ করেন। তাঁর রাজ্যসীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শুধুমাত্র উত্তর ভারতের মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অথবা গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত

ভারতের বুকে যে অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ রেখে গেছেন, সে আদর্শ হর্ষবর্ধনের আমলে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর হর্ষবর্ধন প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে যে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত। তাই তিনি ভারতের ইতিহাসে "উত্তরাপথনাথ" নামে পরিচিত।

শাসক হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন এই বিশাল সাম্রাজ্যকে সুশাসনে রেখেছিলেন। তিনি কর্মপটু ও সুশিক্ষিত রাজকর্মচারীদের দ্বারা রাজ্য শাসন করতেন। তিনি রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করতেন। প্রজাদের বেশী কর দিতে হত না। তবে দণ্ডবিধির কঠোরতা ছিল। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়কে সমান চোখে দেখতেন। দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল।

বিদ্যোৎসাহী হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করতেন। তাঁর সভাপণ্ডিত বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' নামে তাঁর জীবনীগ্রন্থ এবং 'কাদম্বরী' নামে এক প্রসিদ্ধ উপন্যাস রচনা করেন। হর্ষবর্ধন নিজেও সংস্কৃত ভাষায় 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিনখানা নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ঘটেছিল। তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করতেন।

হর্ষবর্ধনের ধর্মানুরাগ ও দানমেলা

হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে শৈবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং ঐ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর সময়ে রাজধানী কনৌজে একটা ধর্মসম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলনে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ব্যক্তি, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং বহু সামন্ত রাজা যোগ দিয়েছিলেন। গঙ্গা যমুনার সংগমস্থল প্রয়াগে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি দানমেলা বা ধর্মমেলা বসাতেন। এখানে তিনি পাঁচ বছরের সঞ্চিত অর্থ, সোনা, মূল্যবান অলঙ্কার ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সাধু, সন্ন্যাসী ও গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এমনকি তিনি নিজের রাজমুকুট ও রাজপোশাক গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং শেষ পর্যন্ত ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একখানা সাধারণ বস্ত্র চেয়ে নিয়ে পরতেন। এই মেলায় বুদ্ধ, শিব ও সূর্যের উপাসনা হত।

হিউয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ ও বিবরণ

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের আরো বহু কথা আমরা জানতে পারি হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-কাহিনী থেকে। হিউয়েন-সাঙ্ ছিলেন একজন চৈনিক পর্যটক। তিনি কিভাবে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন এবং কিভাবে আবার চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সে-সব কথা তোমরা আগেই পড়েছ। তিনি চোদ্দ বছর ভারতে কাটিয়ে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে বহু রাজ্য ঘুরেছেন, বহু কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখে রেখে গেছেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী থেকে আমরা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর জীবনযাত্রা, সামাজিক অবস্থা এবং ভারতের ধর্ম ও শিক্ষার কথা জানতে পারি।

হিউয়েন-সাঙ্ তাঁর বিবরণীতে হর্ষবর্ধনের বীরত্ব, শাসনদক্ষতা, দানশীলতা ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রশংসা করেছেন। তাঁর বিবরণীতে হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজের ধর্মসম্মেলনের এবং প্রয়াগের দানমেলার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি গভীর আগ্রহের এবং ঐ ধর্ম প্রচারের কথা উল্লেখ করে গেছেন। কনৌজ শহরের সৌন্দর্য, সুন্দর মঠ ও মন্দির তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। রাজগৃহ, পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তী প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী ও দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চি ও বাতাপী নগরের কথাও তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়।

ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা ও চরিত্র

হিউয়েন-সাঙ্ তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা ও চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। সে সময়ে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খুব কমে গিয়েছিল এবং বৌদ্ধগণ আঠারোটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ছিল এবং



হিউয়েন-সাঙ্

অস্পৃশ্যতা বেড়ে গিয়েছিল। ভারতবাসীদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, ভারতবাসীরা সৎ ও সত্যবাদী, তারা মিথ্যা কথা বলতে অথবা অপরকে ঠকাতে জানে না। তারা সত্য বা প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল। তিনি নিজেও দস্যুর হাতে পড়েছিলেন। আবার আচরণে ভারতবাসীরা সরল

ছিল। বেশী লোকে লেখাপড়া জানত না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রচলন ছিল। সমাজে ধনী লোকের অভাব ছিল না। তারা শিল্প ও বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত থাকত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা আছে। সে সময়ের পাটলিপুত্রের দক্ষিণে নালন্দা নামক গ্রামে (বর্তমান পাটনা জেলার বড়গাঁও) একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মাটি খুঁড়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এখানে এশিয়ার নানা দেশ থেকে ছাত্ররা এসে অধ্যয়ন করত। তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। ভারতে আরও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, কিন্তু নালন্দার সঙ্গে কোনটার তুলনা করা যায় না। সুদূর চীন, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল থেকে ছাত্ররা এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা করতে আসত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে দ্বারপণ্ডিতেরা থাকতেন। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তবে ছাত্রেরা ভিতরে প্রবেশ করতে পারত। এখানে ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক একত্রে থাকতেন। তাদের খাদ্য, পোশাক, বিছানা ও চিকিৎসার জন্যে কোন খরচ দিতে হত না। দেশের রাজা, ধনীরা ও জনসাধারণ তাদের



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

শিক্ষার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করতেন। পড়াশুনার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। একশো বক্তৃতা-গৃহ ছিল। সেখানে আচার্যগণ ছাত্রদের বক্তৃতা দিতেন। গ্রন্থাগারও ছিল বিরাট। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এবং ছাত্রদের বাসস্থানে চমৎকার শৃঙ্খলা ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ যখন এখানে অধ্যয়ন করতেন তখন বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। শীলভদ্রের মত অতবড় পণ্ডিত চীন বা ভারতে ছিল না। হিউয়েন-সাঙ্ নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের জ্ঞানের গভীরতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। ছাত্রগণ সকলেই ছিল সুপণ্ডিত, পবিত্রচরিত্র ও প্রখর বুদ্ধিমান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

(খ) রাজপুতজাতির উদ্ভব

হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বা গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্ত বা পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধনের মত শক্তিশালী কোন সম্রাট সে সময়ে উত্তর ভারতে ছিলেন না। উত্তর ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বৈদেশিক গুর্জর প্রতিহারগণ ভারতে প্রবেশ করে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু দশম শতাব্দী থেকে গুর্জর প্রতিহারদের পতন ঘটতে থাকে। তখন থেকেই উত্তর ভারতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটতে থাকে, তেমনি বিভিন্ন বংশ ঐসব রাজ্য শাসন করতে থাকেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাহী বংশ, মালবে পারমার বংশ, বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্ল বংশ, আজমীর ও দিল্লীতে চৌহান বংশ, দাহল রাজ্যে চেদী বংশ, কাশ্মীরে কার্কট বংশ এবং বাংলায় পালবংশ রাজত্ব করছিলেন। এঁরা অধিকাংশ সামন্তরাজ ছিলেন। এইসব রাজাদের মধ্যে কোন রকম রাজনৈতিক ঐক্যবোধ ছিল না, বরং তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। ফলে উত্তর ভারতের সর্বত্র একটা রাজনৈতিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। সেই সুযোগে ভারতে মুসলমান অভিযান শুরু হয় এবং ঐসব বংশ মুসলমানদের বাধা দেয়।

রাজপুত জাতির পরিচয়

এখন গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে উত্তর ভারতে যে চন্দেল্ল, গাহড়বাল, কলচুরি, পারমার, চৌহান, চালুক্য, (সোলাঙ্কী) প্রভৃতি বংশের উদ্ভব ঘটেছিল তারাই ভারতে রাজপুত নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে রাজপুতদের আদি পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। রাজপুত রাজগণ নিজেদের পুরাণে কথিত সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজপুত রাজগণ মুসলমান আক্রমণ থেকে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্যে মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিলেন; সুতরাং রাজপুতরা ভারতীয় জাতির লোক। আধুনিক ঐতিহাসিক রাজপুতদের শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতিসমূহের মিশ্রণে গঠিত জাতি বলে মনে করেন। তাঁরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুসমাজে মিশে গিয়েছিলেন। রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে সঠিক কিছু না বলা গেলেও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিপত্তিলাভ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চন্দেল্ল বংশ

চন্দেল্লবংশীয় রাজগণ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বুন্দেলখণ্ডে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশ দুশো বছরের অধিককাল স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল খাজুরাহো। এদের প্রথম শক্তিশালী রাজা বঙ্গ, এলাহবাদ, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর প্রভৃতি স্থান তাঁর রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। চন্দেল্লবংশীয় রাজগণ

খাজুরাহোর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুতুবুদ্দিনের আক্রমণে চন্দেল্লগণ দুর্বল হয়ে পড়েন।

চেদীবংশ

বর্তমান জব্বলপুরে দাহল বা ত্রিপুরীতে নবম শতাব্দীতে চেদী বা কলচুরিগণ একটা রাজ্য স্থাপন করেন। এ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা লক্ষ্মণরাজের আমলে চেদী রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পায়। দশম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চেদীরাজগণের প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অন্যান্য রাজপুতশক্তির আক্রমণে এবং দিল্লীর সুলতানগণের ক্রমাগত আক্রমণে চেদীরাজ্য বিধ্বস্ত হয়।

পরমার

পারমার বংশ

পারমারগণ রাষ্ট্রকূট রাজগণের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছর পারমারগণ রাজত্ব করেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ভোজরাজ। তিনি শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজধানী ধার শিল্প-সাহিত্যের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। চালুক্য ও চেদী রাজগণের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ভোজের মৃত্যুর পর পারমারগণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

চৌহান বংশ

রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান বংশ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এরা গুর্জর প্রতিহারগণের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লী ও আজমীরকে কেন্দ্র করে চৌহান রাজ্য স্থাপিত হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। তিনি মহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীঃ) জয়ী হন। কিন্তু তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) তিনি পরাজিত ও নিহত হন। চৌহান বংশও প্রায় তিনশো বছর রাজত্ব করেন।

সোলাঙ্কি বংশ

রাজপুত জাতির অন্যতম শাখা চৌলুক্য বা সোলাঙ্কী বংশ। গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে সোলাঙ্কি রাজ্য স্থাপিত হয়। এদের রাজধানী ছিল আনহিলবারা। এ বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন কুমার পাল ও দ্বিতীয় ভীম। কুমার পালের আমলে সোলাঙ্কি রাজ্যের বিস্তার ঘটে। দ্বিতীয় ভীমের পর এ বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। সোলাঙ্কি বংশও তিনশো বছর রাজত্ব করেছিলেন।

গাহড়বাল বংশ

গাহড়বাল বংশীয় রাজগণ প্রথমে কাশীতে রাজ্য স্থাপন করেন এবং পরে একাদশ শতাব্দীতে কনৌজ তাঁদের অধিকারে আসে। এ বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র ও জয়চন্দ্র। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘুরীকে সাহায্য করেন,

কিন্তু পরে তিনি মহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সে যুদ্ধেই জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন।

পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের সংঘর্ষ

এ যুগে ভারতের আর একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষ। ধর্মপাল যখন গৌড়ে রাজত্ব করছিলেন ঐ সময় তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা ধ্রুব ও তাঁর পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ এবং গুর্জর-প্রতিহার-বংশীয় রাজা বৎসরাজ ও নাগভট্ট। ধর্মপাল কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে (ইন্দ্রায়ুধ) পরাজিত করে তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণ গৌড়রাজকে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব থেকে বিতাড়িত করেন। অল্পকাল পরেই গুর্জর প্রতিহার রাজ নাগভট্ট ধর্মপালকে পরাজিত করে চক্রায়ুধকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেন এবং কনৌজ দখল করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দের আক্রমণে গুর্জর-প্রতিহারগণ পুনরায় রাজপুতানায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল এবং উত্তর ভারতে ধর্মপালের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল প্রতিহাররাজ মিহিরভোজকে পরাজিত করেন। তবে পালরাজ নারায়ণ পাল প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপালের কাছে পরাজিত হওয়ায় মগধ ও উত্তরবংগ কিছুকালের জন্যে গুর্জর-প্রতিহারদের অধীন হয়ে পড়ে।

ঐক্যবন্ধ সাম্রাজ্য গঠনে অক্ষমতা ও সামন্তরাজার উদ্ভব

উত্তর ভারতে অনেকগুলো রাজপুত বংশ এবং পালবংশ প্রায় তিনশো বছর ধরে রাজত্ব করলেও তাদের কারো পক্ষে ঐক্যবন্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। রাজপুত শক্তিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা রূপে রাজত্ব করছিলেন। তাঁদের ঐক্যবন্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অক্ষমতা আরবের মুসলমানদের ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করেছিল।

(গ) বাংলাদেশ ও শশাঙ্ক

শশাঙ্কের পূর্বাবস্থা

শেষ গুপ্তরাজগণের অযোগ্যতা এবং হূণ জাতির ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রায় ভেঙে পড়েছিল। ফলে গুপ্ত রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। গুপ্তবংশের কেউ কেউ এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশও স্বাধীন হয়েছিল।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের সিংহাসন লাভ

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে মহাসেনগুপ্ত নামে গুপ্তবংশীয় এক রাজা গৌড় ও মগধে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। শশাঙ্ক ছিলেন তাঁর সেনাপতি। মহাসেনগুপ্ত মারা গেলে সম্ভবতঃ ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক গৌড়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সেকালে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ নিয়ে গৌড়রাজ্য গঠিত ছিল। মহারাজ শশাঙ্ক বাঙালী ছিলেন। তাঁর বংশ ও বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা যায় যে, বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই সার্বভৌম নরপতি। তিনি

গৌড়কে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ বা রাঙামাটি।

শশাঙ্কের যুদ্ধযাত্রা ও রাজ্যবিস্তার

গৌড়ের রাজা হবার পর তিনি বাংলাদেশ ও মগধ অধিকার করেছিলেন। তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। মৌখরীদের আক্রমণ থেকে গৌড়কে রক্ষা করবার জন্যে তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে কনৌজ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কনৌজরাজ গ্রহবর্মন পরাজিত ও নিহত হন। গ্রহবর্মন ছিলেন থানেশ্বরের রাজার জামাতা। সুতরাং থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে গৌড় ও মালবের যুদ্ধ বাধে। গৌড়রাজ শশাঙ্ক থানেশ্বরের রাজকন্যা এবং গ্রহবর্মনের রাণী রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করে থানেশ্বর-রাজ রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। অতঃপর রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ভগিনীর উদ্ধার ও ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন হর্ষবর্ধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। তবে শশাঙ্কের জীবদ্দশায় গৌড়-মগধ, উৎকল ও কঙ্গোদ তাঁর অধীন ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন মগধ এবং ভাস্কর-বর্মন কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটে। তাঁর রাজ্য দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী গঞ্জাম জেলা এবং পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শশাঙ্কের পূর্বে অন্য কোন বাঙালী এত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি।

শশাঙ্কের ধর্মমত

শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বহু বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেন এবং বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু হত্যা করেন। হিউয়েন সাঙ্ লিখেছেন যে তিনি বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেছিলেন। এ পাপের জন্যে তিনি নাকি গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই কাহিনী সত্য কিনা বলা কঠিন।

শশাঙ্কের কৃতিত্ব

বাংলার ইতিহাসে বাঙালী হিসেবে শশাঙ্কের কৃতিত্ব অপরিসীম। তিনিই বাংলার প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি। সামান্য সেনাপতি থেকে জীবন শুরু করে সার্বভৌম রাজা হওয়ার কৃতিত্ব একান্তভাবে তাঁরই। তাঁর বীরত্বে বাঙালীর মর্যাদা সুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বাংলাদেশকে প্রথম সর্বভারতীয় গৌরবদান করেন।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি

পাল ও সেন রাজাদের আমলে পাঁচশো বছরের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই সময় রাজনৈতিক প্রগতি ছাড়াও, বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আর্য ও অনার্যদের সংমিশ্রণে যে বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার প্রকাশ দেখা যায় পাল রাজাদের আমলে। প্রাচীন বাংলায় লিখিত চর্যাপদ-গুলোতে, বাঙালীর সমাজ-জীবনের কথা কিছু কিছু জানা যায়। তাছাড়া, প্রাচীনলিপি,

শিল্প নিদর্শন ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকেও অল্প তথ্য এ বিষয়ে সংগ্রহ করা যায়।

বাঙালীর পরিচয় : হিউয়েন-সাঙ্ তাঁর বিবরণীতে বাঙালীর চরিত্রের খুব প্রশংসা করেছেন। সমতটের লোকেরা স্বভাবতঃ শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তের লোকেরা দৃঢ় ও নির্ভীক এবং কর্ণসুবর্ণের লোকেরা সাধু ও অমায়িক ছিলেন। তিনি বাঙালীর শিক্ষার প্রতি অনুরাগের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। লেখাপড়া শেখবার জন্যে বাঙালী দূর দেশে পর্যন্তও যেত। বাঙালীদের মধ্যে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, গণিত, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ, আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ, তন্ত্র প্রভৃতির পঠন-পাঠন ছিল। ক্ষেমেন্দ্র ও বিজ্ঞানেশ্বর গৌড়ের লোকদের কলহপ্রিয় বলে অভিহিত করেছেন।

জাতি : জনসাধারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তবে পাল ও সেন যুগে বৈদ্য, কায়স্থ, গন্ধবণিক, মোদক, তন্তুবায় শ্রেণীর সূচনা হয়েছিল। সেনরাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। প্রাচীন চর্যাপদে ডোম, চণ্ডাল ও শবর জাতির বিবরণ পাওয়া যায়। তারা সমাজে অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত। তারা বাঁশের ঝুড়ি বানাত ও তাঁত বুনত। মেয়েরা নেচে গেয়ে বেড়াত। শবরেরা পাহাড়ে বাস করত। পুলিন্দ নামে আর একশ্রেণীর আদিম জাতি বাংলা দেশে বাস করত। তারা বনে বাস করত এবং তীর, ধনুক ও খড়্গ ব্যবহার করতে জানত।

সমাজে মেয়েদের স্থান : চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের ন্যায় যৌথ-পরিবার তখনকার সমাজ-জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য। ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, ভাই-বোন, বাবা-মা নিয়ে গঠিত পরিবারে পুরুষদের প্রাধান্য ছিল। পুরুষদের পক্ষে বহুবিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। তবে সমাজে নারীর স্বাধীনতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়েছিল। পিতাই ছিল সংসারের কর্তা। সুতরাং সমাজে নারীকে সর্বদাই পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হত। কন্যা, স্ত্রী ও মাতাকে যথাযোগ্য শিক্ষা ও সম্মান দেওয়া হত। বাল্যকালে কন্যাকে নাচ, গান, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি চারুশিল্পে পারদর্শিনী করে তোলা হত। তারা দর্শন ও যুদ্ধ বিদ্যা ও শিক্ষালাভ করতে পারত। শিক্ষার শেষে কন্যাদের বিয়ে দেওয়া হত। সেযুগে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপাত্য, গান্ধর্ব প্রভৃতি বিবাহ-রীতির প্রচলন ছিল। সমাজে নারীর সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিধবাদের পুনরায় বিয়ে হত না। অপুত্রক স্ত্রীরা স্বামীর সম্পত্তি পেত। বাৎস্যায়ন বাংলার মেয়েদের মৃদুভাষিণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতী বলে বর্ণনা করেছেন।

খাদ্য : প্রাচীনকাল থেকে বাঙালীরা ভাত ভালবাসে। মাছ, হরিণ, ছাগ, ও পাখীর মাংস, নানারকম মশলা দেওয়া নিরামিষ তরকারি, মিষ্টি, পিঠে-পায়েস, দই, দুধ, ক্ষীর প্রভৃতি দুধের খাবার ছিল বাঙালীর খাদ্য। বাংলায় ব্রাহ্মণেরা আমিষ ভোজন করতেন। ব্রাহ্মণ-সমাজে মাছ-মাংস খাওয়া নিন্দনীয় ছিল। সেকালে ইলিশ মাছ এবং পূর্ববঙ্গে শুটকী-মাছের আদর ছিল। কলা, তাল, আম, নারিকেল প্রভৃতি ফলও খাদ্যের মধ্যে ছিল। নানারূপ মাদক পানীয় ব্যবহৃত হত।

পোশাক : ধুতি ও শাড়ীই ছিল বাঙালীর প্রধান পোশাক। তখন পুরুষের হাঁটুর

নীচে ধুতি পরার চলন ছিল না। তারা মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরত। পুরুষেরা উড়ানি ব্যবহার করত। মেয়েদের শাড়ী পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছত। মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করত। তাদের শাড়ীতে নানারকম নক্সা থাকত। তখন কার্পাস, রেশম, পশমের তৈরী বস্ত্র ব্যবহৃত হত। উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সম্ভবতঃ বিশেষ পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল।

অঙ্গ-ভূষণ ঃ পুরুষ ও মেয়েরা উভয়েই আংটি, কানে কুণ্ডল, গলায় হার, হাতে বলয়, কোমরে মেখলা ও পায়ে মল পরত। কেবল মেয়েরা শাঁখের বলয় ব্যবহার করত। মেয়েরা অনেক সময় হাতে চুড়ি পরত। ধনীরা সোনা, রূপা, মণি-মুক্তোর গহনা ব্যবহার করত। স্ত্রী-পুরুষ কেউই শিরোভূষণ ব্যবহার করত না। পুরুষেরা বাবরি চুল রাখত, মেয়েরা নানা রকম খোঁপা বাঁধত। মেয়েদের শৌখিনতা ছিল না। তবে টিপ, আলতা, কাজল, কুমকুম পরার রেওয়াজ ছিল। বিয়ে হলে মেয়েরা সিঁদুর পরত। সেকালে পুরুষদের চামড়ার জুতো, কাঠের খড়ম ও ছাতা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আমোদ-প্রমোদ ঃ রাজা রাজড়াদের মধ্যে শিকারই ছিল প্রধান আমোদ। নিম্নস্তরের লোকেদের মধ্যে কুস্তি ও নানারকম শারীরিক কসরত প্রচলিত ছিল। পাশা, দাবা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশ-পঁচিশ প্রভৃতি খেলা বাঙালীদের প্রিয় ছিল। তখন বাঙালীর জীবনে বাজি রেখে জুয়া, নাটকাভিনয়, নাচ-গান, মোরগের লড়াই প্রভৃতি আমোদের ব্যবস্থা ছিল। বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, করতাল, এমনকি মাটির ভাণ্ডও বাদ্য-যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হত। মেয়েরা উদ্যান-রচনা, জলক্রীড়া প্রভৃতি ভালবাসত। দোল, দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী—বাঙালীর বড় উৎসব ছিল। অন্নপ্রাশন, পৈতাধারণ, বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল।

জীবিকা ঃ পাল ও সেনযুগে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত। কৃষিকাজই ছিল সাধারণের প্রধান উপজীবিকা। তখন গ্রামবাসীরা জমি চাষ করে নানা রকম শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন করত। তখন আখের খুব চাষ হত এবং আখের রস থেকে প্রচুর চিনি ও গুড় তৈরি হত। অধিক পরিমাণে গুড় হত বলে এ দেশের নাম হয় গৌড়। তুলা ও সরিষার যথেষ্ট চাষ ছিল। পানের বরজও অনেক ছিল। নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলা, লেবু প্রভৃতি বহু ফলবান বৃক্ষের চাষ হত। কাপড় বোনা, মাটির ও লোহার জিনিসপত্র তৈরি করে অনেক লোক জীবনধারণ করত। সে সময়ে বিদেশের বাজারে বাংলার তাঁতের কাপড় ও মসলিনের বিশেষ আদর ছিল। কিছুসংখ্যক লোক রাজদরবারে, সেনাবিভাগের নানা পদে চাকরি করে জীবিকা অর্জন করত। বাংলায় তখন অনেক সমৃদ্ধ শহর ছিল।

তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশ উন্নত ছিল। বাংলার তমলুক ও হুগলীর সপ্তগ্রাম ছিল সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বন্দর। এই সব বন্দর থেকে বহু পণ্যদ্রব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরে যেত। স্থল ও জলপথের যানবাহন ছিল গরুর গাড়ী ও নৌকা। ধনী লোকেরা হাতী, ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করত।

জনগণের অবস্থা ঃ গুপ্ত-পরবর্তী কালের চীন পর্যটক এবং মুসলমান পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাংলার অধিবাসীরা সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করত।

তারা সৎ-জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। দেশে মামলা-মোকদ্দমা ছিল না। রাজকর্মচারীরা দেশে শৃঙ্খলা রক্ষা করত। তবে পথঘাট খুব নিরাপদ ছিল না। রাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। সামাজিক অপরাধে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। দেশে শিক্ষা ও জনসেবার জন্যে দাতব্য ব্যবস্থা প্রচুর ছিল।

ধর্ম : বাংলাদেশ আর্যসভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হলেও পালযুগে এখানে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্য ছিল। পালরাজারাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং এই ধর্মের পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। হিউয়েন-সাঙ্ বাংলাদেশে বহু বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সংস্কার সাধন করতে গিয়েছিলেন। বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য কুমার ঘোষ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশের ধর্মগুরু



অতীশ দীপঙ্কর

ছিলেন। বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। হিউয়েন-সাঙ্ নিজেও বাংলাদেশে বহু দিগম্বর জৈন দেখেছিলেন। পাহাড়পুরে একটি জৈন বিহার ছিল। পাল রাজারা যে পরধর্মের প্রতি উদার ছিলেন, এটা তার পরিচয়। শশাঙ্ক ও সেন রাজাদের আমলে হিন্দুধর্মের প্রাবল্য ছিল। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি হিন্দু ধর্মের সম্প্রদায়গুলো পাশাপাশি শান্তিতে নিজস্ব ধর্ম আচরণ করত। সেন রাজাদের আমলে বিষ্ণু শিব, পার্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার প্রচলন শুরু হয় ও বহু মন্দির নির্মিত হয়।

শিক্ষা ও সাহিত্য : শিক্ষা বিস্তারের দিক থেকে পাল যুগের গুরুত্ব অপরিসীম। পালরাজাদের আমলে ওদন্তপুর, জগদ্দল, সোমপুর, পাহাড়পুর, বিক্রমপুর ও বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ওদন্তপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গোপাল। এটা নালন্দার কাছে অবস্থিত ছিল। এখানে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। এর গ্রন্থাগার খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। মেধাবী ছাত্ররা এখানে বিনা খরচে শিক্ষালাভ করতে পারত। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ওদন্তপুরের ছাত্র ছিলেন। পালযুগে বিক্রমশিলা মহাবিহার একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। বর্তমান বিহারের ভাগলপুর জেলায় উহা অবস্থিত ছিল। নদীর তীরে পাহাড়ের উপরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৭টা মন্দির ও ৬টা মহা-বিদ্যালয় ছিল। এখানে ১১৪ জন আচার্য

নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। প্রধান আচার্য ছিলেন বাঙালী অভয়াকার গুপ্ত। তিব্বত ও নেপালের ছাত্ররাই এখানে বেশী সংখ্যায় পড়তে আসতেন। বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্র এখানে পড়ান হত। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিক্রমশিলায় কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ধর্মপালের আর একটি বিহারের নাম সোমপুরী বিহার। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে সোমপুরী বিহারের বিরাট ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিক্রমপুরের বিক্রমপুরী বিহারও সেযুগে অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ধর্মপাল শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানাস্থানে পঞ্চাশটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ধর্মপাল ও দেবপাল উভয়েই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নালন্দা তখনও বিশ্ববিখ্যাত ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিদ্যার্থী ও আচার্যগণ এই শিক্ষা-কেন্দ্রে যোগদান করতেন।

পালযুগে শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর খ্যাতি ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। পালযুগেই চর্যাপদ নামে বৌদ্ধ দোঁহা ও সঙ্গীত রচিত হয়েছিল। চর্যাপদ-গুলো হল প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন। সংস্কৃত সাহিত্যে পালযুগের 'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী, পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট, 'চিকিৎসা-সংগ্রহ'—রচয়িতা চক্রপাণি দত্ত ও 'দায়ভাগের' লেখক জীমূতবাহনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেন যুগেও সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত ছিল। রাজা বল্লাল সেন 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনও পণ্ডিত এবং শিক্ষা-নুরাগী ছিলেন। বিখ্যাত কবি ধোয়ী 'পবনদূতম্' রচনা করেন। বৈষ্ণব কবি জয়দেব তাঁর সুবিখ্যাত "গীতগোবিন্দম্" নামক কাব্য রচনা করেন। তাছাড়া, এই যুগেই হলায়ুধ, শরণ, উমাপতি ধর, ঈশান, গোবর্ধন প্রভৃতি পণ্ডিত ও কবিগণ জন্মগ্রহণ করেন।

(ঘ) দক্ষিণ ভারত

বাদামীর (বাতাপির) চালুক্য-বংশ

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাতাপিপুরে (বর্তমান বোম্বাই-এর অন্তর্গত বিজাপুর জেলার বাদামী) প্রথম পুলকেশী চালুক্য রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। চালুক্যরাজগণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। কীর্তিবর্মণ ছিলেন এই বংশের প্রকৃত শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী স্থাপয়িতা। তিনি মগধ, বঙ্গ, দ্রাবিড়, গঙ্গা প্রভৃতি ভূখণ্ড জয় করেছিলেন বলে অনুমান করা চলে। তাঁর রাজ্য উত্তরে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে সমুদ্র উপকূল, দক্ষিণে তামিল রাজ্যগুলির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর পরবর্তী নরপতি মঙ্গলেশ দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উপর এক বিশাল অংশ চালুক্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীই ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিউয়েন-সাঙ্ তাঁকে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি কঙ্কণ, গুর্জর, মালব, কলিঙ্গ, বেঙ্গী প্রভৃতি জয় করে বাতাপি-রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। হর্ষবর্ধন ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারত অভিযান করলে দ্বিতীয় পুলকেশী নর্মদাতীরে তাঁকে পরাজিত করেন। তিনি

সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমি নিজের অধিকারে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবগণকে পরাজিত করে পিতার পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের আমলে চালুক্য-বংশের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী নরপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য আরবদের দাক্ষিণাত্যে অভিযান ব্যাহত করেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট-রাজের আক্রমণে দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ পরাজিত হয়ে সিংহাসন হারান। তারপরই চালুক্য-বংশের অবসান ঘটে।

কাঞ্চীর পল্লব-বংশ

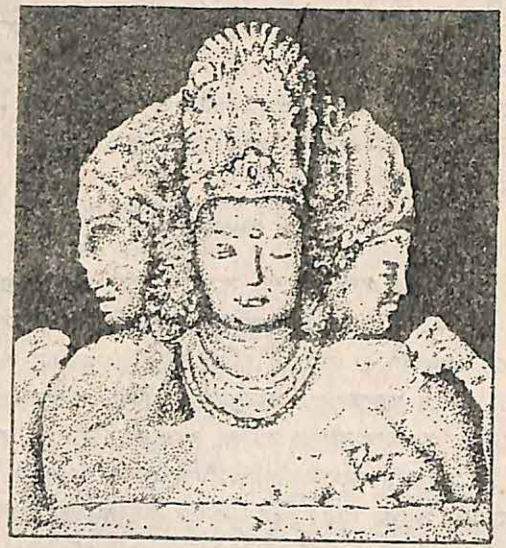
খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লব-বংশের সূত্রপাত হয়। পল্লবদের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন শিবস্কন্দ বর্মণ। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পল্লবগণের রাজধানী ছিল কাঞ্চী (বর্তমান কাঞ্জিভরম্)। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ে পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সমুদ্র-গুপ্তের হাতে পরাজিত হন এবং বশ্যতা স্বীকার করে করদ রাজা হিসেবে হৃতরাজ্য ফিরে পান। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু চোল, চের ও পান্ড রাজ্য জয় করে এক অখন্ড তামিলরাজ্য স্থাপন করেন। এমনকি সিংহল পর্যন্ত তিনি জয় করেছিলেন। সিংহবিষ্ণুর পুত্র ছিলেন মহেন্দ্র বর্মণ। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হন এবং পল্লব-রাজ্যের উত্তরাংশের বেঙ্গী রাজ্য হারান।

মহেন্দ্রবর্মণের মৃত্যুর পর নরসিংহবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে রাজধানী বাতাপি দখল করেন। তিনিই পল্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। এইযুদ্ধে সিংহলের রাজা সাহায্য করেন। বিনিময়ে নরসিংহবর্মণ সিংহলরাজকে চালুক্যদের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সময়েই হিউয়েন-সাঙ্ কাঞ্চিনগর পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। নরসিংহবর্মণের মৃত্যুর পর পল্লবশক্তির পতন শুরু হয়। দ্বিতীয় মহেন্দ্র, দ্বিতীয় পরমেশ্বর, দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ প্রভৃতি রাজারা দীর্ঘকাল শাসন করেন। কিন্তু কাঞ্চীর গৌরব ফেরাতে পারেননি। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজ আদিত্য চোলের হাতে পল্লবরাজ অপরাজিতের পরাজয় ঘটলে পল্লববংশের পতন ঘটে।

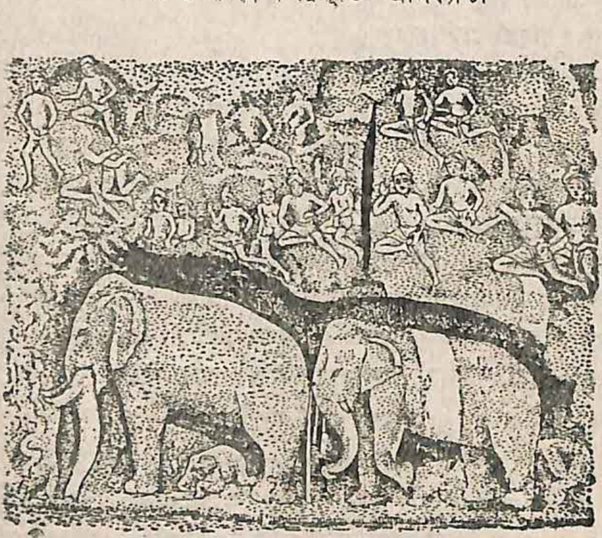
চালুক্য ও পল্লব-শিল্প

চালুক্যগণ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা চালুক্য-রাজ্যের নানা জায়গায় অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। চালুক্যরাজগণের আমলে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী সঙ্গমেশ্বর ও বিরূপাক্ষ মন্দির চালুক্য স্থাপত্য-শিল্পের অতি সুন্দর নিদর্শন। বাতাপির বিষ্ণুমন্দির অপূর্ব শিল্প নিদর্শন। পাহাড়ের গায়ে অনন্তনাগের উপর উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি ও নরসিংহমূর্তি বিখ্যাত। এছাড়াও বাতাপিতে অনেক প্রস্তর-খোদিত মন্দির ও গুহা আছে। চালুক্যরাজগণের আমলে অজন্তা ও

এলিফ্যাণ্টার গুহাচিত্রগুলোরও কিছু কিছু চিত্রিত হয়েছিল। হিউয়েন-সাঙ্ চালুক্যরাজ্যে



শিবের ধ্যানমগ্ন ত্রিমূর্তি—এলিফ্যাণ্টা



মহাবলীপুরমে পর্বতগাত্রে খোদিত ভাস্কর্য

শতাধিক বৌদ্ধমঠ দেখেছিলেন। অজন্তার বিস্ময়কর দেওয়াল-চিত্রগুলো এইসময়েই অংকিত হয়েছিল।

পল্লবগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিকাশ পল্লবদের আমলে আরম্ভ হয়েছিল। আজও কাঞ্চি ও মহাবলীপুরমে পল্লব-শিল্পের নিদর্শন দেখা যায়। পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণের প্রথা রাজা মহেন্দ্রবর্মণ চালু করেন। পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মণ মহাবলীপুরমে পাহাড় কেটে রথের আকারে যে সাতটি মন্দির নির্মাণ করান, তা "সপ্তরথ" নামে পরিচিত। যেমন ধর্মরাজ রথ, ভীম রথ, অর্জুন রথ, দ্রৌপদী রথ ইত্যাদি। তবে কাঞ্চির ত্রিপুরান্তকেশ্বর মন্দির, ঐরাবতেশ্বর মন্দির এবং মহাবলীপুরমের মুক্তেশ্বর ও কৈলাসমন্দির বিখ্যাত। এ সব মন্দিরের সূক্ষ্ম শিল্পকার্য দেখলে অবাক হতে হয়। দক্ষিণ ভারতের এ যুগের শিল্পরীতি "পল্লবী ঢং" নামে পরিচিত। এ শিল্পরীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

চোলদের নৌ-শক্তি

দক্ষিণ ভারতে চোল রাজাদের আমলে সমুদ্রযাত্রা, বাণিজ্য ও রণতরী নির্মাণ বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। চোলরাজগণ নৌ-বলে বলীয়ান ছিলেন। রাজরাজ চোলের নৌ-বাহিনী সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ অধিকার করেছিল। তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোলের আমলে চোলবাহিনী বঙ্গোপসাগর পার হয়ে পেগু, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করেছিল। তাঁদের বাণিজ্য-তরীগুলো ব্রহ্মদেশ, মালয়, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এ রাজ্যের বণিকদের বিরাট সংখ্যক বাণিজ্যপোত ছিল। চোলরাজগণের আমলেই ভারতীয় নৌশক্তি সর্বাপেক্ষা উন্নত হয়ে উঠেছিল।

অনুশীলনী

বিষয়-মুখী প্রশ্ন :

১। ভারতে কত সালে হূণ আক্রমণ শুরু হয়?

২। ভারত-আক্রমণকারী হূণদের কি বলা হত?

৩। ভারতে হূণনেতা কে কে ছিলেন?

৪। শেষ শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাট কে ছিলেন?

৫। ভারতে হূণদের রাজধানী ছিল কোথায়? ৬। পুষ্যভূতি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৭। রাজ্যবর্ধনকে কে হত্যা করেন?

৮। হর্ষবর্ধন কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন?

৯। হর্ষবর্ধনের কি উপাধি ছিল? ১০। হর্ষবর্ধনের সভাকবি কে ছিলেন?

১১। হর্ষবর্ধন কি কি গ্রন্থ রচনা করেন? ১২। হিউয়েন-সাঙ্ কে ছিলেন?

১৩। হিউয়েন-সাঙ্ কত বছর ভারতে ছিলেন?

১৪। নালন্দা কোথায় অবস্থিত ছিল?

১৫। কোন্ বাঙালী পণ্ডিত নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন?

১৬। তৃতীয় পৃথ্বীরাজ কে ছিলেন?

১৭। গৌড়ের প্রথম বাঙালী সম্রাট কে ছিলেন?

১৮। শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?

১৯। বিক্রমশিলার আচার্য কে ছিলেন?

২০। "গীতগোবিন্দম" কে রচনা করেন?
২১। সন্ধ্যাকার নন্দীর রচিত গ্রন্থের নাম কি?
২২। বল্লালসেন কি কি গ্রন্থ রচনা করেন?
২৩। দক্ষিণ ভারতে শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন?
২৪। পল্লবদের শিল্পরীতির নাম কি? ২৫। কখন থেকে হর্ষাব্দ গণনা করা হয়?
২৬। বাংলাদেশে প্রাচীনকালে কি কি বন্দর ছিল?
২৭। চালুক্য-বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। গুপ্ত বংশের পতনকালে কাদের অধীনে কোন্ কোন্ স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল?
২। হর্ষবর্ধন কিভাবে, কোন্ কোন্ রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন?
৩। তিনি কিভাবে রাজ্যশ্রীকে কোথা থেকে উদ্ধার করেন?
৪। হর্ষবর্ধনকে "উত্তরাপথনাথ" বলা হয় কেন?
৫। হর্ষবর্ধনের দানমেলার পরিচয় দাও।
৬। রাজপুতদের পরিচয় কি? কয়েকটা রাজপুত-বংশের নাম লিখ।
৭। চোলরাজগণের নৌ-শক্তি কেমন ছিল?
৮। রাজপুত জাতির উদ্ভবকালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূণ আক্রমণের বর্ণনা দাও এবং এর ফলাফল লিখ।
২। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের সংঘর্ষের কারণ কি? এই সংঘর্ষের বর্ণনা ও ফলাফল লিখ।
৩। শাসক, বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে হর্ষবর্ধনের পরিচয় দাও।
৪। হিউয়েন-সাঙ্-এর ভারতে আগমনের বর্ণনা দাও।
৫। হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ থেকে ভারত ও ভারতবাসীর কথা কি জানা যায়?
৬। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৭। পাল ও সেন বংশের আমলে বাঙালীর সামাজিক জীবন কেমন ছিল?
৮। পাল ও সেন বংশের শাসনকালে শিক্ষা ও সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি ঘটেছিল?
৯। চালুক্য ও পল্লব-শিল্প সম্বন্ধে কি জান?

বাম দিকের কীর্তিগুলোর সঙ্গে ডান দিকের বংশগুলো সাজাও।

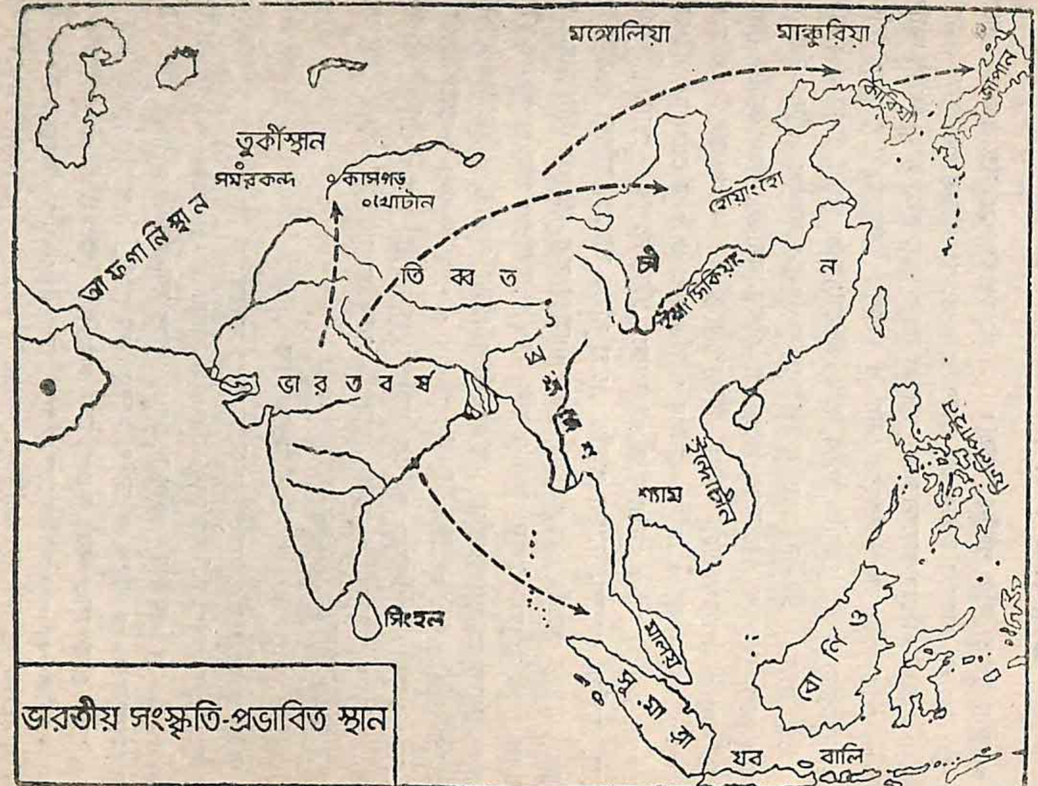
অজন্তা	পালবংশ
কৈলাস মন্দির	চন্দেল্লবংশ
ওদন্তপুর বিহার	চালুক্য বংশ
ভারতীয় নৌশক্তি	
দানমেলা	চৌহান বংশ
খাজুরাহো	পল্লব বংশ
তরাইনের যুদ্ধ	পুষ্যভূতি বংশ

মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন সংস্কৃতির প্রসার

ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন সভ্যতা। এই সভ্যতা শুধু মাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের বাইরে এর প্রভাব দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহু প্রাচীনকাল থেকেই স্থাপিত হয়েছিল। মৌর্যবংশের রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও মহামতি অশোকের রাজত্বকালে সিরিয়া, মিনার, ম্যাসিডন, সিংহল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এই যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ এবং ব্যাপক হয়ে উঠতে থাকে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে রোমান সাম্রাজ্য, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে জলপথে এবং অপর দিকে মধ্য এশিয়া, ব্যাবিলোনীয়া এমনকি মিশরের সঙ্গেও স্থল ও জলপথে ব্যবসা চলত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভারত থেকে শুধু মণি মুক্তো, হাতীর দাঁতের জিনিষ, মসলিন প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য ঐসব দেশে রপ্তানী হয়নি, তার সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকেরাও যেতেন। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। ধর্ম, ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে যে যোগাযোগ শুরু হয়েছিল তাতে মালয়, কম্বোজ, আনাম, বলি, যবদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি বৃহত্তর দ্বীপময় বিস্তৃত অঞ্চলে কেবল ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েনি, ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের পথও প্রশস্ত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতকের অন্তর্বর্তীকালে এই সব দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল তা সংস্কৃতলিপি ও চৈনিক পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ঐ সব দেশের সভ্যতা অনেক উন্নতি লাভ করেছিল।

মধ্য-এশিয়া

মহারাজ অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে ও পশ্চিমে বিস্তার লাভ করেছিল। পরে বৌদ্ধধর্মী কুষাণগণ যখন মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তখন বাহ্লীক ও নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হয়। এই সব অঞ্চলের ধর্মযাজক ও বণিকদের চেষ্টায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা প্রায় সমগ্র মধ্য-এশিয়ায় প্রসার লাভ করে। মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয়রা এসে যে সব সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগর নির্মাণ করেছিল তা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা এবং উপনিবেশ যে স্থাপিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে চীন পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ গোবি মরুভূমি অতিক্রম করবার সময় এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাঁর বিবরণে এই সব উল্লেখ করে গেছেন। সম্প্রতি বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেলষ্টাইন মধ্য-এশিয়া ও বেলুচিস্তানের কোন কোন অংশে মাটি খুঁড়ে অতীত ইতিহাসের নিদর্শন স্বরূপ প্রস্তর-লিপি, মঠ, অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ প্রতিকৃতি, হিন্দু দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধ



ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রভাবিত স্থান

মন্দির প্রভৃতি আবিষ্কার করেন এবং ঐসব অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল তা প্রমাণ করেন।

খোটান

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল খোটান। কথিত আছে, সম্রাট অশোকের পুত্র কুণাল বিমাতার চক্রান্তে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে খোটানে এসে এক রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাই সর্বপ্রথম ভারতীয় উপনিবেশ। পরবর্তীকালে কুষাণদের সময়ে অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এখানে শিক্ষাবিস্তার করেছিলেন। সেকালে বৌদ্ধধর্ম ছিল খোটানের প্রধান ধর্ম। ঐস্থানে বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার ছিল। খোটানে গোমতী বিহার খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ বিহারে তিন হাজার সন্ন্যাসী বাস করতেন এবং চীন দেশের বহু পণ্ডিত সেখানে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়বার জন্যে আসতেন। চীনপর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসবার সময় এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন। প্রতি বছর খোটানে বুদ্ধযাত্রার উৎসব হত। এই উৎসবের কথাও ফা-হিয়েন লিখে গেছেন। একটা রথের ভিতরে থাকত বুদ্ধমূর্তি, আর সকলের আগে চলত গোমতী বিহারের ভিক্ষুরা। রথ টেনে এনে যখন নগরের ফটকের কাছে আনা হত তখন খোটানরাজ মুকুট ও পাদুকা খুলে রেখে বুদ্ধমূর্তির পূজা করতেন।

কুষাণ যুগের পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে পূর্ব তুর্কীস্থানে ভারতীয় উপনিবেশ ছেয়ে গেল। শৈলদেশে (কাশগড়), চোককুর (ইয়ারখন্দ), কুচী (কুচা), কারাশর (অগ্নিদেশ), তুন্-হোয়াং, ভরুক প্রভৃতি ছোট ছোট ঔপনিবেশিক রাজ্য তুর্কীস্থানে স্থাপিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে খোটান ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র। আরবীয়রা যখন তুন্-হোয়াং অধিকার করে তখন সেখানের বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা প্রাচীন পুঁথিপত্র একটা গুহায় রেখে গুহার মুখ বন্ধ রেখে বিদেশে পালিয়ে গেল। প্রায় এক হাজার বছর পরে এই সব পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে—পুঁথির সংখ্যা বিশ হাজারের উপর।

মধ্য এশিয়ার পুঁথিপত্রে ভীম, নন্দসেন, শ্যামসেন প্রভৃতি হিন্দু পণ্ডিতদের নাম দেখতে পাওয়া যায়। সেখানকার কয়েকটা সীলমোহরে কুবের, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে। সুতরাং মধ্য এশিয়ার হিন্দুধর্ম একেবারে অজানা ছিল না।

চীন

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দুশো বছর আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে চীনের সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিল। ভারত থেকে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদের প্রভাব চীনে ছড়িয়ে পড়ে। চীনদেশ থেকে দলে দলে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতবর্ষে তীর্থ করতে এবং ঐ দেশের বহু পণ্ডিতেরা বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে ভারতে আসতেন। অনেকে এদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনে নিয়ে গিয়ে যত্নের সহিত চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। চীনা ভারত-ভ্রমণকারীদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ্, ই-সিং বিশেষ প্রসিদ্ধ। এঁদের চেষ্টায় চীনা ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ করা হয় এবং চীনের জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ভারতের কুষাণ আমলে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন নামে দুজন ভারতীয় ভিক্ষু পুঁথিপত্র নিয়ে গিয়ে চীনদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করে বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় পণ্ডিত ধর্মমিত্র, সংঘভূতি

প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মন বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে তিনি চীনে গিয়ে চীনাভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অনুবাদ করেছিলেন শোনা যায়। যে সব ভারতীয় পণ্ডিত চীনে গিয়ে ধর্ম ও শাস্ত্র প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের মধ্যে ভারতীয় পণ্ডিত কুমারজীবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে। তিনি চীনে ৩০ বছর অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি চীনের সর্বত্র দীক্ষাগুরুর সম্মানলাভ করেছিলেন।

তিব্বত ও দূরপ্রাচ্য

তিব্বতও ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার জন্যে ভারতের কাছে ঋণী। তিব্বতের প্রসিদ্ধ রাজা স্রং-আন্-গ্যাম্পে ৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লাসা নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর এক রাণী ছিলেন চীন সম্রাটের কন্যা। রাণীর অনুরোধে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, ভারত থেকে ধর্মপ্রচারক নিয়ে গিয়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করান। ভারতীয় পণ্ডিতগণের সহায়তায় তিনি অনেক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করান এবং ভারতীয় বর্ণমালার আদর্শে তাঁর সময়ে তিব্বতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে বহু তিব্বতীয় ছাত্র নালন্দা বৌদ্ধবিহারে এসে শিক্ষালাভ করত। ভারত থেকে বৌদ্ধ আচার্যরা তিব্বতে যেতেন। ভারতীয় পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অন্য নাম অতীশ) একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এই বাঙালী বৌদ্ধ সাধুর চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু সংস্কার সাধন এবং তিব্বতী ভাষায় হাজার হাজার পুঁথি অনুবাদ করা হয়েছিল।

বিক্রমপুরের ব্রজযোগিনী গ্রামে দীপঙ্করের জন্ম হয় (৯৮০ খ্রীঃ অঃ)। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। ১৯ বছর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারের বৌদ্ধ আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর নাম হয় "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান"। অল্প বয়সে তিনি দর্শন ও ধর্ম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। রাজা নয়পালের আমলে তিনি বিক্রমশিলা বিহারের অধ্যক্ষ হন। কিছুকাল পরে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাবার উপক্রম হলে তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভর আমন্ত্রণে তিনি তিব্বতে যান এবং মহাযান ধর্ম প্রচার করেন। ১০৫৩ খ্রীঃ অঃ তাঁর মৃত্যু হয়। আজও তিব্বতীরা অতীশ দীপঙ্করের পূজা করে।

কালক্রমে তিব্বত ও চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ দূর প্রাচ্যের কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, জাপানে প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ অষ্টম শতকে ভারতীয় পণ্ডিত বোধিসেন জাপানে গিয়েছিলেন। জাপানে তিনি একটা বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। জাপান, চীন ও তিব্বতে এখনও বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে।

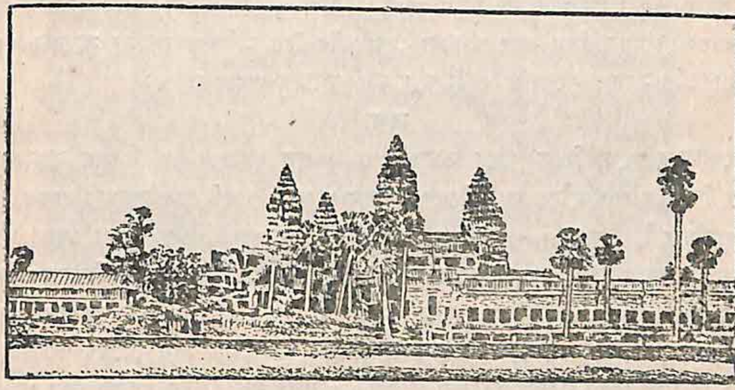
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (সুবর্ণভূমি)

প্রাচীনকাল থেকে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মালয়, আনাম, কাম্বোডিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপগুলোর সঙ্গে জলপথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিল। ভারতের লোকের কাছে দূর-প্রাচ্যের এই অংশ সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত। এই দেশগুলোতে শৈব ও বৌদ্ধধর্ম বিকাশলাভ করেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে এই

অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। ভারতের তমলুক বন্দর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতের উপকূলে বহু বন্দর ছিল। এই বন্দরগুলো থেকে ভারতীয় বণিকগণ সুবর্ণভূমির সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এইসব অঞ্চলে ভারতীয় নামধারী কয়েকটি শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। এই সকল রাজবংশের দ্বারা সুবর্ণভূমিতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ এই অঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটেছিল। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম এইসব অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বের পরেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলোতে বহু দিন হিন্দুরাজত্ব বর্তমান ছিল।

কম্বোজ

ইন্দোচীনে ভারতীয় সভ্যতায় প্রধান কেন্দ্র ছিল কম্বোজ (বর্তমান নাম কাম্বোডিয়া)। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে এই অঞ্চলে কম্বোজ নামে এক হিন্দু রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সংস্কৃত ভাষার এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে কৌণ্ডিণ্য নামে এক



অঙ্কোরভাট মন্দির

ব্রাহ্মণ রাজা কম্বোজ রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যকে চীনারা বলত ফুনান্। এই বংশীয় রাজগণ বর্মন উপাধি ধারণ করতেন। কম্বোজের বর্মন বংশীয় রাজারা প্রায় ৯০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের রাজা জয়বর্মন ও সুবর্ণবর্মনের আমলে প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্যগুলোও কম্বোজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সপ্তম জয়বর্মনের সময়ে কম্বোজ রাজ্যের ক্ষমতা সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি চম্পা, দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিও অধিকার করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে থাইজাতি ও আনামিদের আক্রমণে কম্বোজ রাজ্যের পতন ঘটে।

কম্বোজের রাজা জয়বর্মন যশোধরপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। যশোধরপুরের বর্তমান নাম আঙ্কোরথম্। কম্বোজের সবচেয়ে বড় রাজা ছিলেন যশোবর্মন। তাঁর সময়ে এই নগরের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নগরের চারদিকে ৩০০ ফুট চওড়া পরিখা ছিল। নগরটা ছিল দৈর্ঘে ২ মাইল এবং প্রস্থে ২ মাইল। নগরে প্রবেশের

জন্যে পাঁচটা তোরণ-দ্বার ছিল। এই নগরের কেন্দ্রস্থলে ছিল পিরামিডের আকারে একটা শিবমন্দির। উহাতে ৪০টা চূড়া ছিল। এই মন্দিরের স্থাপত্য ও শিল্পকার্য আজও দর্শকদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। চীনা রাজদূত যশোধরপুর নগরের অত্যন্ত সুখ্যাতি করেছেন। তিনি যশোধরপুরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগর বলেছেন।

কম্বোজে শৈবধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কালিদাসের রঘুবংশের অনুকরণে লিখিত রাজা ভববর্মনের প্রশস্তি দেখে মনে হয় তখনকার দিনে এই অঞ্চলেও সংস্কৃত ভাষা প্রসার লাভ করেছিল। কম্বোজের হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। রাজা সুবর্ণবর্মনের সময়ে কম্বোজের বিখ্যাত আঙ্কোরভাট মন্দিরের নির্মাণ শুরু হয়। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু মন্দির। এই মন্দিরের চারদিকে পরিখা ও প্রাচীর। মন্দিরটা ½ মাইল চওড়া ও ⅔ মাইল লম্বা একটা প্রকাণ্ড সমতল বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দির-প্রাচীরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী, রাজা ও রাজসভা, সেনাদল, পুরোহিতগণ প্রভৃতির খোদাই-করা সুন্দর দৃশ্য বর্তমান যুগের দর্শকদের বিস্মিত করে। কম্বোজের বায়ন মন্দিরের কোন প্রাচীন লিপি পাওয়া যায়নি। তবে বায়নের প্রস্তর-প্রাচীরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত আছে। সুতরাং কম্বোজ রাজ্য ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

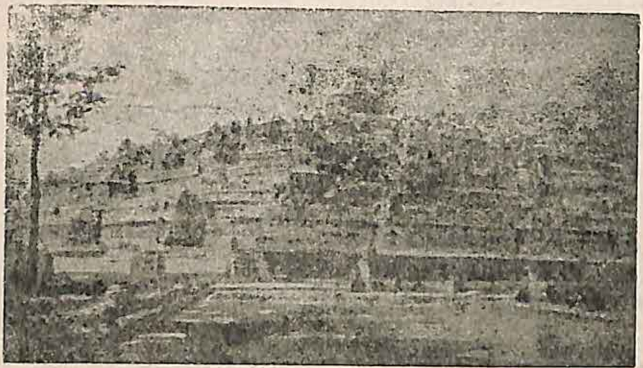
চম্পা

কম্বোজের পূর্ব দিকে অপর ভারতীয় রাজ্য হল চম্পা। এর বর্তমান নাম আনাম। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয়গণ এখানে রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। চম্পা-রাজ্য অমরাবতী, বিজয় ও পান্ডুরঙ্গ নামে তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। চতুর্থ শতকের শেষভাগে ভদ্রবর্মন নামে এক হিন্দু রাজা এই তিনটি প্রদেশে রাজত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চম্পারাজ্য স্থায়ী ছিল। এই রাজ্যের রাজাদের মধ্যে ঈশ্বরমূর্তি, হরিবর্মন, জয়সিংহবর্মন প্রভৃতি রাজগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চম্পা কম্বোজের অধীন হয়। কিন্তু অল্প দিন পরেই উহা স্বাধীনতা লাভ করে। এই রাজ্যে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির এবং জনবহুল নগরসমূহ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে, কৃষি-শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সমগ্র রাজ্য ধন-ঐশ্বর্যে পূর্ণ ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণগণের স্থান ছিল উচ্চে। এদেশে শিবপূজার প্রচলন ছিল। সংস্কৃত ছিল সমগ্র রাজ্যের ভাষা। চম্পার রাজারা মহর্ষি ভৃগুর বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। হিন্দু সভ্যতা যে চম্পায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটা তার প্রমাণ। প্রতিবেশী চীনা ও মোঙ্গলগণের আক্রমণে চম্পারাজ্য পঞ্চদশ শতকের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়।

মালয় ও ইন্দোনেশিয়া

মালয় উপদ্বীপ ও নিকটবর্তী সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জে (বর্তমান নাম ইন্দোনেশিয়া) যে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল তার নাম শৈলেন্দ্র রাজ্য বা শ্রীবিজয়। মালয় উপদ্বীপে যদিও খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল, অষ্টম শতকে যখন শৈলেন্দ্র বংশের অধীনে একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তখন ইহা শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য স্থাপন

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের কীর্তি। এই বংশের রাজারা মহারাজা উপাধি ধারণ করতেন। ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন রাজাই শৈলেন্দ্র রাজগণের সমকক্ষ ছিলেন না। ৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক আরব লেখক লিখেছেন যে, "তৎকালীন শৈলেন্দ্র রাজাই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্বাপেক্ষা ধনী সম্রাট ছিলেন।" তাঁদের দৈনিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল দুশো মণ সোনা। আরব বণিকেরাও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করতে আসত। শৈলেন্দ্র রাজাদের একটা শক্তিশালী নৌবহর এবং প্রচুর অর্থ ছিল। আরবীয় লেখকেরা লিখেছেন যে শৈলেন্দ্র রাজাদের একটা শক্তিশালী নৌ-বহর এবং প্রচুর অর্থ ছিল। আরবীয় লেখকেরা লিখেছেন যে শৈলেন্দ্র রাজা প্রতিদিন সকালে একটা করে সোনার ইট হ্রদের জলে নিক্ষেপ করতেন। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের ধর্ম ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্ম। যবদ্বীপে ও বলিতে বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি শৈবধর্মও প্রচারিত



বোরোবুদুর মন্দির

হয়েছিল। বাংলার বৌদ্ধ সাধু কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব বাংলার রাজা দেবপালের আমলে নালন্দায় একটা বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেছিলেন। তখন ভারত ও চীনের সঙ্গে তাঁদের পরস্পর দূত বিনিময় হত।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে গেছেন। যবদ্বীপের বিখ্যাত বোরোবুদুর মন্দির শৈলেন্দ্র রাজগণের কীর্তি। মন্দিরটা পাহাড়ের উপর স্থাপিত এবং পর পর নয়টা স্তরে নির্মিত। মন্দিরের শীর্ষে একটা ঘণ্টাকৃতি স্তূপ। এই মন্দিরের শিল্পকার্য এবং বৌদ্ধ জাতকের অসংখ্য চিত্রাবলী দেখলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। যবদ্বীপে অবশ্য আরো অনেক ভগ্ন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এগুলো ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জাভায় ভারতীয় শিল্প এবং সাহিত্যের যেমন বিকাশ ঘটেছিল, অন্য কোথাও তেমন হয়নি। আজও জাভায় অসংখ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এখানে রামায়ণ ও মহাভারত খুবই জনপ্রিয় ছিল। জাভায় এই দুই মহাকাব্যের ঘটনা নিয়ে নাটকের অভিনয় আজও হয়ে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোল রাজাদের আক্রমণে শৈলেন্দ্র বা শ্রীবিজয়

সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের শেষ হিন্দুরাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে শৈলেন্দ্র রাজ্যের অবসান ঘটে।

ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও সিংহল

ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম শ্যাম (বর্তমান থাইল্যান্ড), ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে বিস্তার লাভ করে। এ সব জায়গায় যে ধরণের বৌদ্ধ মন্দির দেখা যায় তাকে প্যাগোডা বলে। প্যাগোডাগুলো কাঠের তৈরী হয়, এগুলো দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের রথের মত। প্রাচীনযুগে ভারতেও কাঠের মন্দির তৈরী হত। তাদের প্রভাব ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে আজও বর্তমান আছে। ভারতের আবহাওয়ায় কাঠের মন্দিরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

ব্রহ্মদেশে হিন্দু দেবমূর্তি ও পালি ভাষায় রচিত ধর্মপুস্তক পাওয়া গেছে। অশোকের সময়ে এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ব্রহ্মে শ্রীক্ষেত্র নামে এক হিন্দু রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। শ্যামদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সেই দেশের মন্দির ও বিভিন্ন স্থানের নামকরণের মধ্যে দেখা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সিংহলের সঙ্গে ভারতের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সিংহলের বর্তমান অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশ ভারত থেকে আগত ঔপনিবেশিকদের বংশধর। তামিল সিংহলের অন্যতম ভাষা। কথিত আছে ভগবান বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন তখন বাংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ লঙ্কাদ্বীপ জয় করে এর নাম দিয়েছিলেন সিংহল। সম্রাট অশোক নিজপুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে ভ্রাতা) এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে (মতান্তরে ভগিনী) সিংহলে বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় একটা মন্দির স্থাপন করেন। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উত্তর ভারতের বিখ্যাত পালি-ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ সিংহলে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সিংহলে "অনুরাধাপুর" ও "পোলোনারুবার" নামে দুটো প্রসিদ্ধ বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হয়েছিল। সিংহলের সিগিরিয়ার গুহাচিত্রে অজন্তার শিল্পরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতের তামিল-রাজগণ সিংহলে আধিপত্য বিস্তার করলে, সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবেশ ঘটে। তবে বৌদ্ধধর্ম সিংহলের প্রধান ধর্ম। এখানকার মঠ, মন্দির ও বিহার ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প ও চিত্রকলার প্রতিচ্ছবি।

সমগ্র এশিয়া মহাদেশেই ভারত থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সমগ্র এশিয়ার ধর্মগুরু ছিল ভারত। এদেশ থেকেই বৌদ্ধধর্ম এশিয়ার সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, বেশভূষা, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির মধ্যে ভারতীয় প্রভাব এখনো দেখা যায়। অন্যদিকে ভাষা ও সাহিত্যেরও প্রভাব বিস্তার লাভ করে। অথচ এর জন্যে কোন যুদ্ধ বা রক্তপাত ঘটেনি। শান্তিপূর্ণ উপায়ে উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতার এমন বিস্তার পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়।

অনুশীলনী

বিষয়-মুখী প্রশ্ন :

১। মধ্য এশিয়ার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন কে?
২। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙ্ কে ছিলেন?
৩। কোন্ ভারতীয় পণ্ডিত চীন দেশে দীক্ষাগুরুর ভূমিকা নিয়েছিলেন?
৪। তিব্বতের প্রসিদ্ধ রাজা কে ছিলেন?
৫। কোন্ বাঙালী বৌদ্ধ সাধু তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন?
৬। চম্পা ও কম্বোজের বর্তমান নাম কি? ৭। বোরোবুদুর কোথায় অবস্থিত?
৮। চীনারা কম্বোজকে কি বলত? ৯। কোন্ সাম্রাজ্যকে শ্রীবিজয় বলে?
১০। শৈলেন্দ্র বংশের কোন্ রাজা নালন্দায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন?
১১। শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু কে ছিলেন?
১২। সিংহলে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কিভাবে ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল?
২। মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলতে কোন্ কোন্ দেশকে বোঝায়?
৩। সুবর্ণভূমি বলতে কোন্ দেশকে বোঝায়?
৪। আঙ্কোরভাট মন্দিরের বিবরণ দাও।
৫। বোরোবুদুর মন্দিরের সৌন্দর্য বর্ণনা কর।
৬। প্যাগোডা কাকে বলে? ৭। ভারতমহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের নাম কি?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
২। সুবর্ণভূমির সভ্যতার বিবরণ দাও।
৩। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৪। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্মের কিরূপ বিস্তার সাধন ঘটেছিল?
৫। সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার সম্বন্ধে কি জান?
৬। বামদিকের যে কথাটার সঙ্গে ডানদিকের যে নম্বরের উক্তিটা প্রয়োগ করা যায় সে নম্বরটা বন্ধনীর মধ্যে লেখ—

(ক) অরেলস্টাইন	( )	১। বৌদ্ধবিহার
(খ) ফা-হিয়েন	( )	২। কম্বোজের বিখ্যাত মন্দির
(গ) কুমারজীব	( )	৩। বৌদ্ধ মন্দির
(ঘ) নালন্দা	( )	৪। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক
(ঙ) আঙ্কোর ভাট	( )	৫। চীনা পর্যটক
(চ) মেঘবর্ণ	( )	৬। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা
(ছ) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান	( )	৭। যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ মন্দির
(জ) প্যাগোডা	( )	৮। সিংহলের রাজা
(ঝ) বোরোবুদুর	( )	৯। বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ
(ঞ) বালপুত্রদেব	( )	১০। ভারতীয় পণ্ডিত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানগণ

(১২০৬—১৫২৬ খ্রীঃ)

আব্বাসি সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতির লোকেরা বিশাল সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নিয়েছিল। এদের তুর্কী বলা হত। এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। আলপ্তগীন নামে এক তুর্কী ক্রীতদাসের অধীনে আফগানিস্তানের গজনীতে প্রথম তুর্ক-আফগান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা সুলতান মামুদ ধনরত্ন লুণ্ঠন করে গজনী নগরীকে সুন্দর করে সাজাবার উদ্দেশ্যে সতেরোবার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করেন। সুলতান মামুদের কিছুকাল পরে 'খোয়ারিজম্' তুর্কী মহম্মদ ঘোরী পারস্যের উত্তরে ঘুর রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি প্রধানত ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি ভারতে তাঁর অধিকৃত রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্যে কুতুবুদ্দিন আইবক নামক তুর্কী ক্রীতদাসকে রেখে যান। কুতুবুদ্দিন আইবক ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দিল্লীতে স্বাধীন তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বংশের নাম হল দাস-বংশ। এই বংশ ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের এগারজন সুলতানের মধ্যে, ইলতুৎমিস, রিজিয়া, নাসিরুদ্দিন ও গিয়াসুদ্দিন বলবন উল্লেখযোগ্য। তুর্কীরা প্রধানত যাযাবর জাতীয় দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষে হানা দেয়। মধ্যযুগে যেমন মিশর, প্যালেস্টাইন, স্পেন প্রভৃতি দেশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি ভারতবর্ষে হয়েছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের ৪/৫ অংশ মুসলিম সৈন্যদের প্রাপ্য ছিল। এই ধনলোভেই ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠনে সৈন্যরা উৎসাহবোধ করত।

যা হোক দাস বংশের পতনের পর ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্ক-আফগান খলজী বংশ ভারতবর্ষ শাসন করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন খলজী। তিনি উত্তর ভারত ছাড়া দক্ষিণ ভারতের বিরাট অংশ দিল্লী সুলতানীর অধীনে আনয়ন করেন। তারপর তুঘলক বংশের শাসন শুরু হয় এবং ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা শাসন করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। তাঁর আমলে দিল্লীর সুলতানী ধ্বংসের সূত্রপাত ঘটে। ফিরোজ তুঘলক এই বংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন। এরপর আরব জাতীয় সৈয়দ বংশ ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। ইতিমধ্যে চাঘতাই তুর্কী বংশীয় বীর তৈমুরলঙ্ ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুলতানী শাসন করেন। কিন্তু শেষ দুই বংশে যোগ্যতাসম্পন্ন সুলতানের অভাবে অধীনস্থ রাজ্যগুলো একে একে স্বাধীন হতে থাকে এবং ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঘলবীর বাবরের আক্রমণে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ঘটে। ফলে দিল্লী সুলতানীর তথা তুর্ক-আফগান যুগের অবসান ঘটে।

এই দীর্ঘ ৩২০ বছরের তুর্ক-আফগান শাসনকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই যুগে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা

দিল। বৈদেশিক মুসলিম-প্রভাব প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃ[illegible] বিস্তার করল।



আলাউদ্দিন খলজী



মহম্মদ বিন-তুঘলক

সে সময়ের কথা ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাণী, মিনহাজউস সিরাজ এবং কবি আমীর খসরু প্রভৃতি ব্যক্তির রচনা হতে এবং ইবন্ বতুতা, ফা-হিয়েন, নিকলো কান্তি, আবদুর রেজ্জাক, নিকিতিন প্রভৃতি বৈদেশিক পর্যটকদের রচনা থেকে জানা যায়।

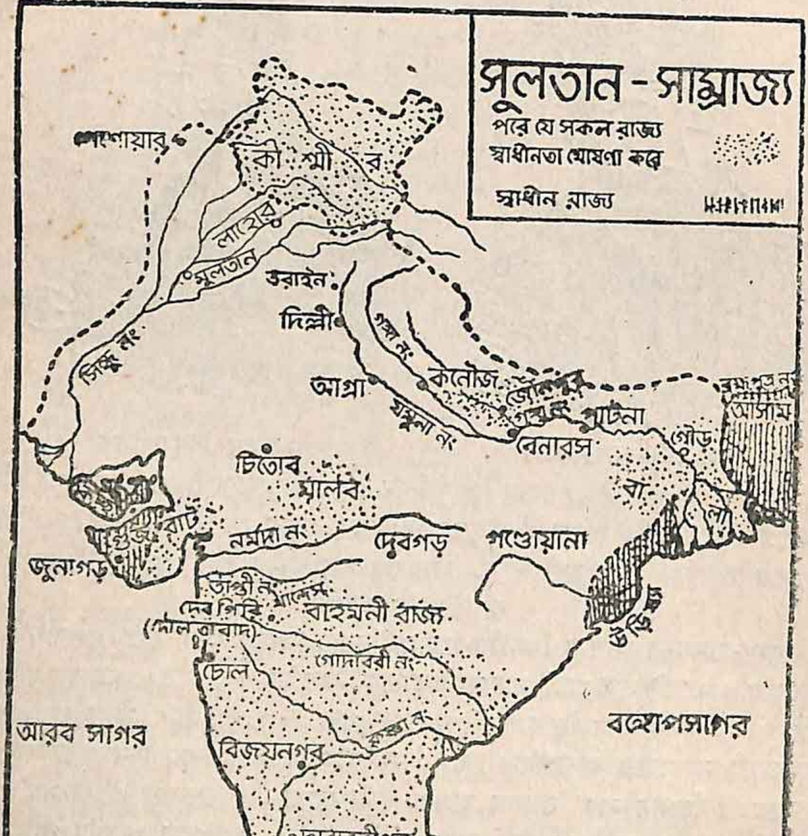
রাজনৈতিক অবস্থা

তুর্ক-আফগান আমলে দিল্লীর সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে। আলাউদ্দিন খলজীর আমলেই সুলতানী সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের কিয়দংশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষ সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দিল্লীর সুলতানগণ শাসন ব্যাপারে বেশী মনোযোগী ছিলেন না। রাজস্ব আদায়, হিন্দুদের অর্থ শোষণে এবং সামরিক বাহিনীর ব্যাপারে তাঁদের শাসন-ব্যবস্থা কঠোর ছিল। সুলতান ও তাঁর পরিবার, মালিক ও আমীর-ওমরাহগণ ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকতেন। আলাউদ্দিন খলজী ও ফিরোজ শাহ তুঘলক সুশাসক ছিলেন। তবে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে ভারতের বহু রাজ্য সুলতানী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

সামাজিক অবস্থা

সুলতানী আমলে ভারতে দুই শ্রেণীর লোক ছিল—বিজেতা মুসলমান ও বিজিত হিন্দু। সমাজের শীর্ষস্থানে ছিলেন সুলতান ও সুলতানের পরিবার। তাঁদের পরে ছিল সম্ভ্রান্তশ্রেণী—আমীর, ওমরাহ, উলেমা, কাজী ও উচ্চ রাজকর্মচারী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ছিল চিকিৎসক, লেখক, গণক, বণিক, সৈনিক ও শিল্পী। সর্বনিম্নে কৃষক,

শ্রমিক ও ক্রীতদাস ছিল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হাতে প্রচুর অর্থ থাকায় তারা ভোগ-বিলাস, মদ্যপান, ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা দোষে দুষ্ট ছিল। তাদের অসংখ্য ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী থাকত। সমাজে কাজী ও উলেমাদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের দুরবস্থা ছিল কিন্তু তাদের কোন বদভ্যাস ছিল না। মুসলমান সমাজে



পর্দাপ্রথা ছিল। মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দু নারীকে রক্ষা করবার জন্য হিন্দু-সমাজে বাল্যবিবাহ ও পর্দাপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল। হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ

নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সতীদাহ প্রথা ও জাতিভেদ তখনো চালু ছিল। দরবারে নাচ-গান ও উৎসব হত। হোলি, বৈশাখী ও মহরম প্রভৃতি সামাজিক উৎসব হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে করত। নাচ-গান, শিকার, খেলাধুলা, গ্রাম্য মেলায় হিন্দু-মুসলমান একত্রে মিলিত হত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সুলতানী আমলে ভারতবর্ষ অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিল। এদেশের ধনরত্ন বিদেশী তুর্ক-আফগানদের লোভের জিনিস ছিল। এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষি, শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কৃষিতে ভারত উন্নত ছিল। শ্রমশিল্পের মধ্যে উন্নত ছিল বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প ও প্রস্তরশিল্প। দেশে কাপড়, কাগজ, চিনি, ইট, অস্ত্রশস্ত্র, মদ ও প্রসাধন দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। রেশম ও পশমের বস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হত। বস্ত্রশিল্পে বঙ্গদেশ ও গুজরাট সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল। এ যুগে গুজরাটের বরোচ, দক্ষিণের কালিকট, পশ্চিম বাংলার সপ্তগ্রাম বিখ্যাত বন্দর ছিল। এসব বন্দর দিয়ে কৃষিজাত দ্রব্য, কাপড়, নীল ও আফিম রপ্তানি হত এবং বিদেশ থেকে বিলাস-দ্রব্য, খচ্চর, ঘোড়া ও ক্রীতদাস আমদানি করা হত। দেশের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম অল্প ছিল। সুলতানী যুগে হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তাদের জিজিয়া কর, তীর্থকর এবং বেশী পরিমাণে রাজস্ব ও শুল্ক দিতে হত। হিন্দুরা শতকরা পঞ্চাশ-ভাগ শস্যকর দিতেন। দেশে অজন্মা হলে দুর্ভিক্ষ হত। বিদেশী পর্যটকেরা বিজয়নগর রাজ্যের ঐশ্বর্যের প্রশংসা করেছেন। কবি আমীর খসরু সুলতানদের শোষণ ও উৎপীড়ন সম্পর্কে বলেছিলেন—"রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা দরিদ্র কৃষকদের চক্ষু হতে পতিত রক্তবিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়।"

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পর তারা এদেশে মুসলিম ধর্ম প্রচার করতে থাকলে হিন্দু-সমাজের কঠোরতা ও গোঁড়ামি আরো বেড়ে যায়। মুসলমানগণও দীর্ঘকাল এদেশে বাস করলেও ভারতের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়নি, বরং নিজেদের সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করেনি। ফলে ভারতীয় ও ইসলামীয় সভ্যতার মধ্যে বিভেদ গড়ে ওঠে। মুসলমানরা অ-মুসলমানদের জিম্মি ও কাফের মনে করত, আর অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানরা ছিল ম্লেচ্ছ ও যবন।

তবুও প্রাকৃতিক নিয়মে ভারতীয় ও ইসলামীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলন গড়ে ওঠে। এর কতকগুলো কারণ ছিল। প্রথমতঃ দীর্ঘ তিন শতাব্দীকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে উভয় জাতির বিদ্বেষ, ঘৃণা ও বিভেদের কঠোর মনোভাব কমতে থাকে। পরস্পরের ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক কারণে দুই সম্প্রদায় ক্রমশ কাছাকাছি এসে পড়ে এবং হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে প্রভাবিত করতে থাকে। তৃতীয়তঃ, মুসলমানেরা বহু হিন্দু নারীকে বিয়ে করার ফলে হিন্দুসমাজের অনেক রীতিনীতি, প্রথা, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং জীবনযাত্রা-প্রণালী মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ

হল সুলতানী আমলে উভয় সমাজে কয়েকজন সাধু ও ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ধর্ম সম্পর্কে একেশ্বরবাদী ছিলেন, সমাজের সকল মানুষকে ভাই বলে মনে করতেন। তাঁদের উদারতা ও ধর্মীয় সহনশীলতা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম, সমাজ, সভ্যতার মধ্যে মিলন ঘটাবার পথ প্রশস্ত করে। এই ধর্মসংস্কারকগণ হলেন মধ্য ভারতের রামানন্দ, কাশীর কবীর, বাংলার চৈতন্য, পাঞ্জাবের নানক, মহারাষ্ট্রের নামদেব। তাঁদের সঙ্গে কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবেদিন এবং পণ্ডিত আলবেরুণীর নামও উল্লেখ করতে হয়।

উদার ধর্মসংস্কারকদের ধর্মীয় মিলনের নতুন মতবাদকে হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদ ও ইসলামের সুফিবাদ বলা হত। ভক্তিবাদীদের শিক্ষা হল—ভগবানের সঙ্গে মানবাত্মার মিলন এবং ভক্তির দ্বারা ভগবানকে উপলব্ধিই সকল ধর্মের মূল কথা। সকল ধর্মই মূলতঃ এক। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বড় কথা নয়। ভগবানের চোখে সকল ধর্মের ও সকল সম্প্রদায়ের লোক সমান। উপাসনা ও অন্তরের ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। যাঁরা এই নতুন ধর্মমত প্রচার করলেন তাঁদের মধ্যে কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কবীর

মুসলমান জোলা (তাঁতী) পরিবারে সাধু কবীরের জন্ম হয়েছিল। তিনি রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি হিন্দু বা মুসলমান কোন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে



কবীর



নানক

বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন—"যিনি হিন্দুর ঈশ্বর, তিনিই মুসলমানের আল্লাহ। যিনি রাম, তিনিই রহিম। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই। তিনিই সকল মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই।" তাঁর মতে ভক্তির দ্বারা, মানুষের প্রতি সৎ ব্যবহারের দ্বারা এবং ভগবানে গভীর বিশ্বাসের দ্বারা

ভগবানকে লাভ করা যায়। মন্দির বা মসজিদের আচার-অনুষ্ঠান বড় কথা নয়। তাই হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁর শিষ্য ছিল। এদের "কবীরপন্থী" বলা হত। তাঁর ধর্মমূলক হিন্দী গানগুলো 'দোঁহা' নামে পরিচিত।

নানক

নানক ছিলেন শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে,—ভগবান এক ও অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। তিনি হিন্দুর জাতিভেদ, মূর্তিপূজা ও দেবদেবীর পূজায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মই সত্য। তিনি ধর্মের বাইরের আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান অপেক্ষা ঈশ্বরে ভক্তি, সৎকাজ ও মানুষের প্রতি সৎ আচরণ বড় মনে করতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁর শিষ্য ছিল। তাঁর শিষ্যগণ "শিখ" নামে পরিচিত। তাঁর উপদেশ যে গ্রন্থে লেখা আছে তার নাম 'গ্রন্থসাহেব'।



শ্রীচৈতন্য

নানকের সমসাময়িক ছিলেন বাংলার শ্রীচৈতন্য। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম। ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রেম, জীবে দয়া এবং জাত ও ধর্মের বিচার না করে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা, এই ছিল তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল কথা। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। তাঁর মতে ভগবানের নামকীর্তনই ভগবানের সাধনার একমাত্র উপায়। কাশী, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব (ভক্তিধর্ম) ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানও তাঁর শিষ্য ছিল। যবন হরিদাস তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

সুলতানী আমলে সাহিত্য ও শিল্প

সুলতানী আমলে আরবী, ফারসী ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছিল। ফারসী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আমীর খসরু। তিনি 'হিন্দুস্থানের বুলবুল' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। মীর হাসান দেহ-লবীও ছিলেন অন্যতম কবি। তিনি বহু কবিতা রচনা করেন এবং নিজামুদ্দিন আউলিয়ার স্মৃতি লেখেন। জিয়াউদ্দিন বারানী সুলতানী যুগের ইতিহাস রচনা করেন।

হিন্দী, বাংলা, পাঞ্জাবী, আরবী, মারাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল। রামানন্দ, কবীর, জগনায়ক, গোরখনাথ প্রভৃতি লেখকেরা হিন্দী সাহিত্য রচনা করেছিলেন। বিজয়নগরে তেলেগু সাহিত্যের বিকাশ হয়েছিল। বাংলা-দেশে ইলিয়াস শাহ, হুসেনশাহ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিগণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। কবি বিজয় গুপ্ত 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী নিয়ে বহু জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ভারতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি এ যুগেই হয়।

তবে সুলতানী আমলে অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশসাধন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পন্ডিত আলবেরুনী সংস্কৃত হতে কতকগুলো দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবেদিনের উদ্যোগে 'মহাভারত' ও 'রাজতরঙ্গিণী' সংস্কৃত থেকে ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু 'ভাগবত' অনুবাদ করেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র উপাধিধারী এক কবি মহাভারত অনুবাদ করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের প্রচেষ্টায় মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়। কবি কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন।

সুলতানী যুগের স্থাপত্য শিল্পেও ভারতীয় ও আফগান শিল্পরীতির মিলন দেখা যায়। দিল্লীর প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি-মন্দিরে মুসলমান শিল্পরীতির প্রভাব বেশী দেখা যায়। দিল্লীর স্থাপত্য-শিল্পের মধ্যে কুতব-মিনার, আলাই দরওয়াজা, জমায়েতখানা মসজিদ, ফিরোজ সমাধি-মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তুঘলকাবাদ, জৌনপুর, ফিরুজাবাদ, বাংলা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে মিশ্র শিল্পরীতি দেখা যায়। জৌনপুরের অতাল মসজিদ ও লাল-দরওয়াজা মসজিদ, বাংলাদেশের আদিনা মসজিদ, ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, কদমরসুল মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা ও তাঁতীপাড়া মসজিদ প্রসিদ্ধ। গুজরাটের জামি মসজিদ ও মুহাফিজ খাঁ মসজিক বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদ ও হাজারমন্দির এবং বিঠলস্বামী মন্দির স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে বাংলাদেশ

সামাজিক অবস্থা

১৩৪৫ হইতে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী রাজগণ রাজত্ব করেছিলেন। এই দু'শ বছর মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে সত্যই এক গৌরবময় অধ্যায়। হুসেন শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটে। তাই হিন্দুরা অনেকটা নিরাপদে ছিল। হিন্দুদের আচার-ব্যবস্থা ও রীতিনীতির সঙ্গে অনেক বিষয়ে মুসলমানদের মিল ছিল। আবার অনেক হিন্দু-মুসলমান বিজেতাদের মত পোষাক পরতেন, দাড়ি রাখতেন ও ফারসী পড়তেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজার প্রচলন হয়। সত্যপীর হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মিলনের ও জাতির সম্প্রীতির পরিচয়। হুসেন শাহ মন্ত্রিপদে গোপীনাথ বসুকে, গৃহচিকিৎসক পদে মুকুন্দদাসকে, প্রধান দেহরক্ষীপদে কেশব ছত্রীকে এবং পরামর্শদাতার পদে রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে নিয়োগ করে হিন্দুপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব এ সময়েই বাংলাদেশে নবদ্বীপ থেকে বৈষ্ণবধর্মের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। মুসলমান যবন হরিদাস চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। এঁর আমলে নবদ্বীপে শাস্ত্রচর্চা হত।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে সাহিত্য ও শিল্পের প্রসার ঘটে। হুসেন শাহের আমলে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন। কাব্যটির নাম "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ কবি পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করিয়েছিলেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর উৎসাহে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। কবি বিপ্রদাস "মনসামঙ্গল" রচনা করেন। হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী "বিদগ্ধ মাধব" ও "ললিত মাধব" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহ উভয়েই শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, এবং হুসেন শাহী বংশের আমলে মালদহের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, পাণ্ডুয়ার একলাখী মসজিদ, কদমরসুল মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ প্রভৃতি সমাধি-মন্দির ও মসজিদগুলো বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ প্রমাণ করে। হুসেন শাহের শাসনকালকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

এই সময়কার বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্য থেকে। তখন উৎপীড়ন ও অন্নকষ্টে বাংলার হিন্দুদের মনে আতঙ্ক জন্মেছিল। তাদের উপর গুরুতর করভার চাপান হত। অনেকেই খাজনা শোধ করতে না পেরে হালের গরু ও ফসল বিক্রী করত। আবার এদিকে প্রজাগণ পাছে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়, এজন্যে কোতোয়ালরা পথরোধ করে পাহারা দিত। এ সময়ে বাংলাদেশ সমৃদ্ধিশালী থাকলেও সুলতান ও অভিজাত পরিবারদের হাতে

বেশীর ভাগ অর্থই থাকত। জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় ছিল। বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশ বিখ্যাত ছিল। দেশের সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষি, শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। মুসলমানদের প্রধান ব্যবসা ছিল দরজিগিরি। কিছু কিছু বণিক-পরিবার প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী ছিল। বাংলাদেশের সোনার গাঁ থেকে জলপথে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। নীল, বস্ত্র, কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হত। দেশে জিনিসের দাম ছিল অল্প।

সুলতানী যুগের শাসন-ব্যবস্থা

সুলতানী যুগ মূলতঃ সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। সে কারণে সুলতানগণ সামরিক শাসনের দিকে অধিক মনোযোগী ছিলেন। তখন সামশেরী (জায়গীরদার) প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমীর ওমরাহদের ক্ষমতা বৃদ্ধির আশঙ্কায় আলাউদ্দিন খলজী ঐ প্রথা উঠিয়ে দেন। সুলতানী শাসনকালে আমীর-ওমরাহদের দমনে ও ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রণে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্য বণ্টন, গুপ্তচর নিয়োগে এবং হিন্দুদের উপর জিজিয়া (মাথাপিছু) কর আদায়ে সুলতানগণ মনোযোগী ছিলেন। এদের শাসনকাল ধর্মীয় সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট ছিল। দাস-বংশ তো অন্যান্য শাসনকার্যে লক্ষ্য দিতে পারেননি। আলাউদ্দিন খলজীই ভারতে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি জিনিসের দাম বেঁধে দেন, সৈন্যদের বেতন দানের ব্যবস্থা করেন। হিন্দুদের হাতে সে সময়ে যথেষ্ট অর্থ ছিল। তিনি তাদের দুর্বিষহ করভারে জর্জরিত করেন। আমীর-ওমরাহদের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। অবশ্য মহম্মদ-বিন-তুঘলক ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে বিচার করা, ধর্মনিরপেক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা ও কৃষির উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। তবে ফিরুজ শাহ তুঘলক শাসনকার্যে দক্ষতা দেখান। তিনি রাজস্বভার লাঘব করেন, সেচ-খাল খনন করেন এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যে 'নিয়োগ-পরিষদ' গঠন ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তবে তিনিও হিন্দু ও শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে সিকন্দর লোদী শাসনকার্যে দক্ষতা দেখান।

অনুশীলনী

বিষয়-মুখী প্রশ্ন :

১। সুলতান মামুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন?

২। দাস-বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে?

৩। খলজী-বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন?

৪। দিল্লীর শেষ সুলতান কে ছিলেন?

৫। কোন্ সুলতানের আমলে সুলতানী সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটে?

৬। কোন্ সুলতানের আমলে সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়?

৭। আমীর খসরু কে ছিলেন?

৮। ইবন বতুতা কে ছিলেন?

৯। কবীরের গানগুলোকে কি বলে?

১০। শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?
১১। কবীরের শিষ্যদের কি বলা হত ?
১২। শ্রীচৈতন্যের মুসলমান শিষ্যের নাম কি ?
১৩। জৈনুল আবেদিন কে ছিলেন ? ১৪। নানকের শিষ্যদের কি বলে ?
১৫। "পদ্মাপুরাণ" রচনা করেন কে ? ১৬। বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন কে ?
১৭। শ্রীচৈতন্য কোন্ ধর্মমত প্রচার করেন ?
১৮। বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান কোন্ দেবতা মানে ?
১৯। কার লেখা গ্রন্থ থেকে সুলতানী আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় ?
২০। হিন্দুস্থানের 'বুল্‌বুল' কাকে বলে ?
২১। তৈমুর লঙ্ কত সালে ভারত আক্রমণ করেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মুসলমানদের ভারত-অভিযানের উদ্দেশ্য কি ছিল ?
২। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে, কাদের মধ্যে হয়েছিল ? এই যুদ্ধের ফল কি ?
৩। সুলতানী আমলে কোন্ কোন্ বংশ দিল্লীতে শাসন করেন ? প্রত্যেক বংশের একজন করে সুলতানের নাম লিখ ?
৪। সুলতানী আমলে কোন্ কোন্ বৈদেশিক পর্যটক ভারতে আসেন ?
৫। হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের পথে কি কি বাধা ছিল ?
৬। সুলতানী আমলের ধর্মসংস্কারকগণের নাম লিখ।
৭। সুলতানী আমলে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনগুলোর নাম কি ?
৮। সুলতানী আমলে ভারতে কোন্ কোন্ প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছিল ?

রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। সুলতানী আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল ?
২। কবীর ও নানকের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান ?
৩। কি কি কারণে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ঘটে ?
৪। সুলতানী আমলে সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ কিরূপ ঘটেছিল ?
৫। হুসেন্ শাহের শাসনকালকে 'বাংলার স্বর্ণযুগ' বলা হয় কেন ?
৬। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৭। শাসনকাল অনুযায়ী বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা লিখে জানাও :

( ) আলাউদ্দিন খিলজী	( ) ইৎতুৎমিস
( ) ইব্রাহিম লোদী	( ) রিজিয়া
( ) মহম্মদ-বিন-তুঘলক	( ) মহম্মদ ঘোরী

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের সমাপ্তি পথে

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কীরা কন্‌স্টান্টিনোপল আক্রমণ করে। তখন তুর্কীদের সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় মহম্মদ। তিনি এক বছর পূর্ব হতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দেড় লক্ষ সৈন্য ও অসংখ্য কামান নিয়ে তিনি কন্‌স্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। খ্রীষ্টানদের পক্ষে ছিল মাত্র আট হাজার সৈনিক। সংখ্যায় অল্প হলেও খ্রীষ্টান সৈনিকেরা সাহসী ছিল। প্রায় দু'মাস ধরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলল। তুর্কীদের বড় বড় কামানের গোলার আঘাতে নগরের প্রাচীর ভেঙে যায়। তখন তুর্কীরা দলে দলে নগরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তিন দিন ধরে হত্যাকাণ্ড চলেছিল এবং পঞ্চাশ হাজার নরনারী তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রির জন্যে এশিয়া মাইনরে প্রেরিত হল। অবশেষে তুর্কীরা দুর্গ দখল করল। গ্রীক ও ইটালীর শেষ বীর সৈন্যদের সঙ্গে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট একাদশ কন্‌স্টানটাইন মৃত্যু বরণ করলেন। তুর্কীরা পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল কন্‌স্টান্টিনোপল অধিকার করল এবং সম্রাট জাস্টিনিয়ানের বিশ্ববিখ্যাত সেন্টসোফিয়ার গির্জাকে মসজিদে পরিণত করল। দেয়াল থেকে খ্রীষ্টান সাধুদের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলা হল এবং বিজয়ী সুলতান মহম্মদ এই মসজিদে প্রবেশ করে নমাজ পড়লেন।

পশ্চিমের নবজাগরণের উপর এর প্রভাব

কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কন্‌স্টান্টিনোপলের পূর্বেই ইউরোপে নবজাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেযুগে কন্‌স্ট্যান্টিনোপল ছিল গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন চর্চার সর্বপ্রধান কেন্দ্র। এখানেই ছিল গ্রীক সাহিত্যের ভাণ্ডার ও গ্রীক মনীষীদের আশ্রয়। তুর্কীরা শহরটি দখল করলে তাদের হাত থেকে এই অমূল্য সাহিত্যসম্পদ রক্ষার জন্যে পণ্ডিতেরা কন্‌স্টান্টিনোপল ত্যাগ করে ইটালীতে প্রাচীন পুঁথিগুলো সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে আসেন। ধীরে ধীরে সারা মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের গ্রীক সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ে এবং সেসব জায়গাতে নতুন করে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলন শুরু হয়। জিজ্ঞাসু ও চিন্তাশীল ইউরোপের হাতে এসে পড়ে সক্রেটিস ও জেনোর দর্শন, প্লেটো ও এরিস্টট্‌ল-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইউরিপিডিস ও এরিস্টফেনিসের নাটক, আর গেলেন ও হিপোক্রেটিসের চিকিৎসাশাস্ত্র। গ্রীক ভাবধারায় ইউরোপের মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল, স্বাধীন চিন্তায় প্রেরণা লাভ করল। ইউরোপের লোক জ্ঞান ও সৌন্দর্যের আলোয় উদ্ভাসিত এক নতুন জীবন দেখতে পেল। এই নবজাগরণকেই বলা হয় 'রেনেসাঁস'। এর ফলে ইউরোপের মানুষ অতীতের বন্ধন ছিন্ন করে নতুন এক মহত্তর সভ্যতার পথে অগ্রসর হল। তাই কন্‌স্টান্টিনোপলের পতনের কাল থেকে মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের আরম্ভ হল ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

নবজাগরণ ও এর বৈশিষ্ট্য

'রেনেসাঁসের আক্ষরিক অর্থ পুনর্জন্ম। গ্রীক ও রোমের সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনই ছিল রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সভ্যতাকে নতুন

ক'র আবিষ্কার ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ইউরোপের মানুষ সেদিন মুক্ত জীবনের সন্ধান পেয়েছিল। পুরাতন লুপ্তপ্রায় গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের ফলে মানুষ নতুনভাবে জীবনকে দেখতে শিখল।

নবজাগরণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সব কিছু জানবার এবং যুক্তি দিয়ে ও তথ্য দিয়ে যাচাই করার মনোভাব জাগ্রত হল। মানুষ যুক্তি-তর্ক দিয়ে শাস্ত্রশাসন ও পৈতৃক বিশ্বাস-গুলোকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল। চিন্তার স্রোতোধারায় অন্ধ বিশ্বাসের বাঁধ আর টেকে না। তারা নানা প্রকারের প্রশ্ন তুলে প্রচলিত নীতি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগিয়ে তুলে সত্যের অনুসন্ধান করতে থাকল।

মধ্যযুগের ধর্মগুরু, সম্রাট এবং সামন্তরা ছিলেন সমাজে সর্বেসর্বা। তাঁদের আদেশ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা দূরে থাকুক তাঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার কথা মধ্যযুগে মানুষ ভাবতেই পারত না। ধর্মের না'মে যুক্তিহীন ও হৃদয়হীন অনুশাসন, সম্রাট, রাজা ও সামন্তদের স্বেচ্ছাচারী শাসন ও নিষ্ঠুর শোষণ লোকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিত। কিন্তু নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে মানুষ জীবনকে নতুন করে দেখতে শিখল। শুরু করল শাস্ত্র, বিধান ও আপ্তবাক্যের সমালোচনা। বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিতর্ক দিয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে আরম্ভ করল।

নবজাগরণের ফলে মানুষের জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকল। চিন্তার স্বাধীনতা, নানা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার এবং উত্তর জানবার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দিল। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, দর্শন এবং আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাতত্ত্ব জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র, শিল্প প্রভৃতি চর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বিদ্বান ও জ্ঞানিগণ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে থাকেন। সেই সঙ্গে ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার ফলে ইউরোপের সর্বত্র শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সাড়া পড়ে গেল। এই নবজাগরণ প্রথম দেখা দেয় ইটালিতে। পরে জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইটালীতে সাহিত্যে দান্তের অনুসরণকারী পেত্রার্ক, তাসো এবং বোকাচিও, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ম্যাকিয়াভেলী, বিজ্ঞানে কোপারনিকাস, ব্রুনো ও গ্যালিলিও মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করে নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ করলেন। ইংলণ্ডে বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার সেক্সপীয়ার এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বেকন বহু গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচনা করে ইংরাজী সাহিত্য ও জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করলেন। স্পেনে সার্ভেন্টিস্, ফ্রান্সে মঁতেন ও মলিয়ের ফরাসী সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করলেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে ইটালীতে রাফায়েল ও লিওনার্দো-দা ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো নতুন যুগ আনলেন। হল্যাণ্ডে রুবেন্স, ভ্যানডাইক, রেমব্রাণ্ট, ভ্যানরিন প্রভৃতি মানবদরদী চিত্রশিল্পিগণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি অঙ্কনে দক্ষতা দেখালেন।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

জগৎকে জানতে হলে এবং জীবনকে সহজ করে তুলতে হলে বিজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন ঘটে। নবজাগরণের যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানচর্চাও ব্যাপকভাবে

শুরু হয়। তবে বিজ্ঞানের উন্নতি এত সহজে হয়নি। কারণ চার্চ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পছন্দ করত না। মধ্যযুগে যাজক ও পণ্ডিতদের এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে, বিশ্বজগতের কেন্দ্র এই পৃথিবী স্থির হয়ে আছে এবং সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কোপারনিকাস নামে একজন বৈজ্ঞানিক এই ভুল বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। ব্রুনো নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক ঐ একই কথা প্রচার করার অপরাধে চার্চের যাজকেরা তাঁকে পুড়িয়ে মারেন।

এই যুগে গ্যালিলিও নামক আর এক নভোবিজ্ঞানী খ্যাতি লাভ করেন। তিনিও বলেন যে, পৃথিবী লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নতুন সত্য ধর্মযাজকদের বোঝাতে গিয়ে গ্যালিলিও বিপদে পড়লেন। তাঁদের ধারণা, যে পৃথিবীতে খ্রীষ্টধর্ম ও চার্চ আছে, সে পৃথিবী কখনও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পারে না। প্রাণদণ্ডের ভয়ে গ্যালিলিও নিজের আবিষ্কৃত সত্যকে অস্বীকার করে চার্চের ভ্রান্ত বিশ্বাস মেনে নিলেন এবং শেষ জীবন পাদ্রীদের কড়া নজরে থেকে কাটালেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেপলার ও ফ্রান্সিস্ বেকনের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভৌগোলিক আবিষ্কার

রেনেসাঁসের যুগের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং ইউরোপের সম্প্রসারণ। ধর্মযুদ্ধের পর প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ খুলে গিয়েছিল। রেনেসাঁস ও সংস্কারের যুগে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করার হিড়িক পড়ে গেল। প্রধানত বাণিজ্য বিস্তার এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচার এই দেশ আবিষ্কারের মূলে প্রেরণা যুগিয়েছিল। উহা রূপ লাভ করে ইউরোপীয় নাবিকদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিষ্ঠার ফলে।

মধ্যযুগের শেষভাগে সমুদ্রযাত্রায় ইউরোপীয়রা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল এবং এই যুগেই ভৌগোলিক জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র, সমুদ্রপথের চার্ট ও মানচিত্র, অক্ষাংশ নির্ধারণ-কৌশল ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকে। মার্কোপোলোর প্রাচ্য-ভ্রমণ-কাহিনী ইউরোপীয় নাবিকদের মধ্যে প্রেরণা যোগায়। সমুদ্র সম্পর্কে ইটালির ও আরবের নাবিকদের অভিজ্ঞতা থাকায় ধর্মযুদ্ধের পর ঐ দুই দেশের বণিকেরা ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। তা দেখে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকদের হিংসা হত। সরাসরি প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্যে পোর্তুগাল প্রথমে উৎসাহী হয়। পোর্তুগীজ রাজকুমার হেনরী আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে দীর্ঘকাল যাবৎ সমুদ্রযাত্রার পরীক্ষা চালান। ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্থলোমিউ দিয়াজ নামে এক পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেন দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে পেঁাছান। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা গামা নামক অন্য একজন পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন। পোর্তুগালের মত স্পেনের রাণী ইসাবেলার আনুকূল্যে ইতালির ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতভ্রমে আমেরিকায় অবতরণ করেন। পরে ইউরোপের লোকেরা বুঝতে পারে কলম্বাস আবিষ্কৃত দেশ এশিয়া নহে, ইহা আমেরিকা মহাদেশ। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিগো ভেসপুচী নামে এক দুঃসাহসিক ইতালীয় নাবিক নতুন মহাদেশ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাগেলান নামে এক রাজকর্মচারী প্রশান্ত

মহাসাগরের মধ্য দিয়ে গুয়াম বর্তমানে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হন। ম্যাগেলানের পর পোর্তুগীজ পিনজন ব্রেজিল ও পিজারো পেরু আবিষ্কার করেন।

আবিষ্কারের প্রভাব

সভ্যতার ইতিহাসে ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক আবিষ্কার ও সমুদ্রযাত্রার উদ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ-বিদেশের মাঝে মহাসমুদ্রের ব্যবধান দূর হল। বাণিজ্যের বন্ধনের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হল। ইউরোপীয়দের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রসার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। আর ইউরোপের সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞান সাতসমুদ্র পার হয়ে এশিয়া ও আমেরিকার দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

ইউরোপের সম্প্রসারণ

পোর্তুগাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে। আর স্পেন প্রধানত সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই দেশ আবিষ্কার ও জয় করেছিল। স্পেন ও পোর্তুগালের মধ্যে যাতে সাম্রাজ্য নিয়ে বিবাদ না বাধে সেজন্যে পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করে এক সীমারেখা টেনে দিলেন। স্পেন পেল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা আর পোর্তুগাল পেল এশিয়া, আফ্রিকা ও ব্রেজিল।

এদিকে ইউরোপে আরও কয়েকটা জাতি নৌবিদ্যা ও নৌবল অর্জন করল। তাদেরও লুটের ভাগ চাই। তাই পোপের ফতোয়াকে অগ্রাহ্য করে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বাণিকেরা পোর্তুগীজদের পথ অনুসরণ করে ভারতবর্ষে এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হল। ভারতের গোয়া, দমন, দিউ বন্দর ছাড়া পোর্তুগীজদের প্রাচ্যের কিছু সাম্রাজ্য তাদের দখলে এল। স্পেনের হাতে রইল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সাফল্য দেখে ফরাসীরা এসে ভারতবর্ষে ভাগ বসাল। ওলন্দাজ ও ফরাসীরা ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। শেষে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হল। ফরাসীরা ইন্দোচীনে ঘাঁটি করল এবং ভারতবর্ষে তাদের রইল মাত্র পণ্ডিচেরী, চন্দননগর ও গোটা কয়েক শহর ও গ্রাম। ওলন্দাজরা ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ভারত থেকে তল্পি গুটিয়ে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সিংহল ও মালয়ে বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করল।

জাতীয় রাষ্ট্র

রেনেসাঁস, সংস্কার-আন্দোলন ও বিপ্লব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এরা একের পর এক আসে। মূলত সংস্কার আন্দোলনে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা দখল নিয়ে বিপ্লব দেখা দিল। সংস্কার-আন্দোলনের সময় পোপের সঙ্গে রাজার ও জনসাধারণের দ্বন্দ্ব চলেছিল। পোপের সঙ্গে এই দ্বন্দ্বের রাজশক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রাজারা জনতার আন্দোলন ও স্বাধীন ধর্মমত দমন করতে লাগলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ম্যাকিয়েভেলির স্বাধীন চিন্তাধারা ইউরোপের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করল। জনসাধারণ

রাজার স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে উৎসুক হল। ফলে ইউরোপে দেখা দিল রাজনৈতিক বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের সঙ্গে গণসংগ্রাম, ইংলণ্ডে রাজশক্তির সঙ্গে পার্লামেন্টের সংঘর্ষ স্পেনের গণ-আন্দোলন, জার্মানীর অধীনতা থেকে হল্যাণ্ডের মুক্তি-আন্দোলন এবং পোর্তুগালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলনের ফলে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন, পোর্তুগাল ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হল।

পুরাতন ও নতুন ভাবধারায় সংঘাত

বিপ্লবী আন্দোলনের মূল কারণ প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার সংঘাত। কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির পিছনে ঐশ্বরিক মতবাদ কার্যকরী ছিল। ইউরোপের সম্রাটগণ মনে করতেন তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঈশ্বরের এই রাজ্যে তাঁরাই একমাত্র শাসনকর্তা। তাঁদের সকল কর্মের জন্যে তাঁরা ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতেন। কিন্তু নবজাগরণের ফলে ম্যাকিয়েভেলির রাজনৈতিক মতবাদ, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উদ্ভব মানবতাবাদীদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করল যে জনগণ দেশের শাসন-ক্ষমতা রাজশক্তির কাছ থেকে নিজেদের হস্তগত করতে আগ্রহী হল। ফলে রাজার সঙ্গে মুক্তিকামী জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বেধে গেল। এমনকি, ইংলণ্ডও এই আন্দোলন থেকে রেহাই পেল না।

ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট সম্রাট প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করল। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রাজা অথবা পার্লামেন্ট কে প্রধান এই দুরূহ প্রশ্ন নিয়েই মহাবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। চার্লসের সমর্থনে ক্যাভেলিয়রগণ এবং অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে রাউণ্ডহেডগণ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লস পার্লামেন্টের সমর্থনকারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। এক বিশেষ আদালতে বিচারের পর ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী প্রকাশ্যে রাজপথে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়। প্রজাসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর অলিভার ক্রমওয়েল ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন।

ঘটনাপঞ্জী

১৪৫৩ খ্রীঃ অঃ কন্স্টান্টিনোপলের পতন। ১৬৪৯ খ্রীঃ অঃ প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড। ১৪৯৮ খ্রীঃ অঃ ভাস্কোদাগামার কালিকট বন্দরে আগমন। ১৫০৩ খ্রীঃ অঃ আমেরিকা আবিষ্কার।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কন্স্টান্টিনোপলের পতন কত সালে ঘটে ?

২। 'রেনেসাঁস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ কি ?

৩। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কে ?

৪। কোন্ তুর্কী সুলতান কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন ঘটান ?

৫। ভাস্কো-দা-গামা কে ছিলেন ?

৬। আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন কে ?

৭। কে ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন ?

৮। ইংলণ্ডের মহাবিদ্রোহের সময় ঐ দেশের সম্রাট ছিলেন কে ?

৯। 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।'—ইহা কোন্ বৈজ্ঞানিক প্রথম আবিষ্কার করেন ?

১০। ইংলণ্ডের মহা বিদ্রোহের গণনেতা কে ছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। কে, কিভাবে কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটান ?

২। কনস্টান্টিনোপলের পতনের ফলে কি হয়েছিল ?

৩। 'রেনেসাঁসে'র সূত্রপাত কোন্ সময়ে হয়েছিল ?

৪। রেনেসাঁসের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ?

৫। ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল ?

৬। কিভাবে, কোথায় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব হল ?

৭। আমেরিকা আবিষ্কার সম্বন্ধে কি জান ?

৮। ইংলণ্ডে মহাবিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। নবজাগরণের ফলাফল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ কি ? কয়েকজন আবিষ্কারকের নামে লেখ। এই আবিষ্কারের ফলে কি হয়েছিল ?

৩। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রভাব সম্বন্ধে কি জান ?

৪। ইউরোপের সম্প্রসারণ কি কারণে এবং কিভাবে হল বল।

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ——খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়।

(খ) ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা——আক্রমণ করে।

(গ) তুর্কীরা বিশ্ববিখ্যাত ——গির্জাকে মসজিদে পরিণত করে।

(ঘ) পোপ——পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করে এক সীমারেখা টেনে দিলেন।

(ঙ) ——প্রাচ্য ভ্রমণ কাহিনী ইউরোপীয় নাবিকদের মধ্যে প্রেরণা জোগায়।

(চ) রেনেসাঁস ——ও বিপ্লব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

যুগ-প্রবাহের ঘটনাবলী

(মধ্যযুগ)

পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দী	বর্বর জাতির আক্রমণ ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন (৪৭৬ খ্রীঃ অঃ)	বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য ও জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল (৫২৭-৫৬৫ খ্রীঃ অঃ)	হজরত মহম্মদের আবির্ভাব (৫৭০ খ্রীঃ অ.) ইসলামের বিস্তার (সপ্তম শতাব্দী)	হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ অঃ ও ভারতে হিউয়েন সাঙ্ (৬৩০-৬৪৪ খ্রীঃ অঃ)
	চীনে তাইসুঙের রাজত্বকাল (৬২৭-৬৫০ খ্রীঃ অঃ) চীনে সুঙ্ বংশ (দশম শতাব্দী	দ পূঃ এশিয়ায় শৈলেন্দ্র বংশের রাজ্য প্রতিষ্ঠা (অষ্টম শতাব্দী)	শার্লেমেনের রাজত্বকাল (৭৬৮-৮১৪ খ্রীঃ অঃ) হারুন-অল রশিদের রাজত্বকাল (৭৮৬ ৮০৯ খ্রীঃ অঃ)	জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার (৫৭৫ খ্রীঃ অঃ) শেতোকুর শাসনকাল সপ্তম শতাব্দী
একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী	প্রথম ধর্মযুদ্ধ (১০৯৬-১০৯৯ খ্রীঃ অঃ)	তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ (১১৮৯-১১৯২ খ্রী অঃ) চতুর্থ ধর্মযুত্ব (১১৯৫-১১৯৮ খ্রীঃ অঃ) ও মিশরের সুলতান সালাদিন এবং আদিল	দিল্লীর সুলতানী শাসন আরম্ভ (১২০৬ খ্রীঃ অঃ)	চীনে কুবলাই খান (১২৮০-১২৯৪ খ্রীঃ অঃ)
	মার্কোপোলোর ভ্রমণ (১২৭১-১২৭৯ খ্রীঃ অঃ)	তৈমুর লঙের দিল্লী লুণ্ঠন (১৩৯৮ খ্রীঃ অঃ)	মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বিস্তার (১২২৭-১২৯৪ খ্রীঃ অঃ)	তরাইনের যুদ্ধ ১১৯১ ও ১১৯২ খ্রীঃ অঃ)
পঞ্চদশ শতাব্দী	কন্স্টাণ্টিনোপলের পতন (১৪৫৩ খ্রীঃ অঃ)	বাংলায় হুশেন শাহের রাজত্বকাল (১৪৮৩-১৫১৯ খ্রীঃ অঃ)	ভাস্কো-দা গামার ভারতে আগমন (১৪৯৮ খ্রীঃ অঃ)	শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ)

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০ মাত্র।